সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য

ডঃ রণজিৎ কুমার সমাদ্দার

চ্যাটার্জী পাবলিশার্স
কলকাতা

উৎসর্গ

শ্রীমতী লীলারাণী সমাদ্দার
শ্রীচরণেষু মাকে

সূচিপত্র

আত্মপক্ষ

আমরা বলেছি 'সাঁওতাল গণযুদ্ধ', কেন যে বলেছি কেন এই বিশেষিত প্রয়োগ তা গ্রন্থের অভ্যন্তরে বলে এসেছি ; আলোচনা ও বিশ্লেষণ সহযোগে। ইংরেজ জমিদার ও মহাজনদের বজ্রমুষ্টি ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সাঁওতালদের জনজাগরণ, সর্বোপরি যুদ্ধ, জীবনযুদ্ধ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। এ কালকেও আলোড়িত করে। আলোড়িত যে হয় তার প্রমাণ একালের সাহিত্যও সংস্কৃতিতে লেগেছে বিচিত্র আভাস, পরিণামী ব্যঞ্জনা। তাই ইতিহাস ও সাহিত্য দুটি শাখাকেই ব্যাপক, অনুপুঙ্খ, বোধযুক্ত ও স্পষ্টতর করার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস নিয়ে তথ্যমালা আছে আমার অগ্রজদের। কিন্তু সাহিত্য আর ইতিহাস নিয়ে বিচিত্রতর অনুসন্ধান এই প্রথম চেষ্টা করা হলো মাত্র। গতানুগতিক পথে হাঁটা নয়, গভীর অন্বেষণ, সরকারি নথি, প্রণম্যদের প্রদত্ত তথ্যপুঞ্জ সবই অনুধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঋণ স্বীকার করি। ত্রুটি আছে। কিছু কিঞ্চিৎ মুদ্রণ প্রমাদ আছে। সুযোগে সংশোধন করবো। সহৃদয় পাঠক মার্জনা করবেন তাও জানি।

এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী উদ্যম নিয়েছেন তরুণ প্রকাশক সত্য চ্যাটার্জী। আমি তাঁকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বন্ধু স্বপন চ্যাটার্জী সিদুর ব্লক দিয়েছেন তাঁকেও শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে নগণ্য গ্রন্থকারকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার।

আমার এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও নবতর বিন্যাসে পাঠক আনন্দিত হলে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলি। নিজ নিকেতন আনন্দের বলেই গ্রন্থ ঢুঁড়ে চলি ; সেটাই সুখের ।।

রণজিৎ কুমার সমাদ্দার

ভূমিকা

ডঃ রণজিৎকুমার সমাদ্দারের 'সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য' পড়ে খুবই ভালো লাগল।

যে-কোনো দেশের মুদ্রিত সাহিত্য সাধারণভাবে লেখাপড়া জানা নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, কল্পনা, অনুভব, ধারণা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করে। সে সবের অনেকখানিই জুড়ে থাকে তার নিজের জীবন। সে যখন শহরের বা আত্ম-বৃত্তের বাইরে তাকায় তখন সকলের আগে চোখে পড়ে কাছে বা দূরে গ্রামের জীবনকে, যে জীবনের সঙ্গে হয়তো তার স্মৃতি ও শিকড়ের যোগ আছে। কিন্তু অরণ্যের আদিবাসীরা তার কাছে দূরবর্তী, প্রান্তিক ও রহস্যময় এক সত্তা। তাদের সে বোঝে না, হয়তো সে তেমনভাবে বুঝতেও চায় না।

ভারতের ইতিহাস অনেকদিন ধরে নাগরিক মধ্যবিত্তের এই ভগ্নাংশিক ধারণার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার জাতীয় জীবনেও নানা ভাঙচুর তৈরি হয়েছে। এ দেশের ইতিহাস নির্মাণ করেছে শুধু রাজারাজড়া এবং তাদের প্রসাদজীবী রাজধানীকেন্দ্রিক 'পাওয়ার এলিট'—এই ভ্রান্ত ইতিহাসবোধে আক্রান্ত ছিলাম আমরা দীর্ঘদিন। শিক্ষিত এলিটেরা আদিবাসী-অরণ্যচরদের উপেক্ষা করেছে, অন্যদিকে টাকাকড়িওয়ালা এলিটরা মহাজন-দোকানদারের বীভৎস চেহারা নিয়ে তাদের শোষণ করেছে। তার সুযোগ নিয়েছে বিদেশী ধর্মপ্রচারকের নানা সম্প্রদায়, যাদের মহত্ত্ব ও সদাশয়তা সব-সময় অবিমিশ্র ছিল না। জাতীয় মূলস্রোতে তাদের আনতে পারিনি বলে মায়াকান্না কেঁদেছি আমরা, কিন্তু এর মূল সমস্যাটা যে আমাদের মধ্যে, তা বুঝতে বড়ো দেরি করে ফেলেছি।

হয়তো এখনও সময় আছে। দেশের ইতিহাস-নির্মাণে অজস্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ সাঁওতালদের যথার্থ ভূমিকার অনুসন্ধান আরও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। এ অনুসন্ধান শুধু তাঁদের সম্বন্ধেই আমাদের বেশি করে জানতে সাহায্য করে না—আমাদের নিজেদেরও চিনতে শেখায়, নিজেদের ভূমিকা নতুন করে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। সে জন্য ডঃ সমাদ্দারের বইটি আমার কাছে এত মূল্যবান।

সাঁওতাল গণযুদ্ধের নায়ক সিদু

প্রথম পর্ব ॥

···কথামুখ···

ভারতের মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ সংখ্যাই সাঁওতাল সম্প্রদায়। সুবৃহৎ এই জনজাতি পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই কম বেশি ছড়িয়ে আছে। আরণ্য পরিবেশে এরা অনায়াস, সরল, শ্রমপটু, স্বভাবে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

সাঁওতালরা 'হড়' নামে নিজেদের চিহ্নিত করে। 'হড়' * কথাটির অর্থ মানুষ। গ্রিয়ার্সন সাহেব সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, কোড়া, টুরি, আসুরি এবং কোরওয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর ভাষাকে 'খেরওয়াড়ি' ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভাষায় বিভিন্ন রূপ থাকলেও একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। কিংবদন্তী আছে, এই সব আদিবাসীদের উৎস এক এবং সকলকেই 'খেরওয়াড়' বা 'খারওয়ার' বলা হতো।[১]

সাঁওতার→সাঁওতাল হলো বৃহৎ দ্রবিড়ীয় এক উপজাতি গোষ্ঠী। ভাষাগত দিক থেকে 'কোলারিয়ান' শ্রেণীর। বিশিষ্ট জাতিতত্ত্ববিদ স্ক্রেফ্‌সরুড (Skrefsrud) মনে করেন, সাঁওতাল 'সাঁওতার'-এর অপভ্রংশ। মেদিনীপুরের 'সাঁওন্ত' নামক স্থানে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসের ফলে ঐ অপভ্রংশ নামটির উদ্ভব। এর পূর্বে তাদের বলা হতো 'খারওয়ার' যার বুৎপত্তিস্থল 'খার' (Khārā Khārās)।[২] আবার এটাও লক্ষণীয়, 'খার' এবং 'হড়' অর্থাৎ মানুষ নামের অর্থ দ্যোতনাই এখানে সমধিক।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'সামন্তপাল' থেকে। শব্দটির অর্থ সীমান্তরক্ষক। মধ্যযুগে 'সামন্তপাল'→'সামন্ত-আল'→সাঁওন্তাল এবং সর্বশেষে সাঁওতাল নামটি অভিহিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেছেন, সাঁওতালরা সীমান্ত রক্ষক হিসাবে ছিল এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি।[৩]

সৃষ্টির পৌরাণিক পরিচয় প্রসঙ্গে এরকম বলা হয়, সাঁওতাল সমাজের আদিম পিতা-মাতা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ীহির মিলনে সাতটি সন্তান জন্মায়। এদের সাতটি গোত্রে ভাগ করা হয়। যথা—কিসকু, হাঁসদা, মুর্মু, হেমব্রম, মার্ডি বা মাণ্ডি, সরেন ও টুডু। পরবর্তীকালে আরও পাঁচটি গোত্রের সৃষ্টি হয়, যেমন—বাস্কে, বেশরা, চঁড়ে, পাঁউরিয়া ও বেদেয়া। মোট বারোটি গোত্রের মধ্যে এগারোটির অস্তিত্ব এখনও আছে। কেবল বেদেয়া গোষ্ঠীর হদিশ মিলছে না। সম্ভবত অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেছে বা বিলুপ্ত হয়েছে। সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাদের সাংস্কৃতিক

* Har, Har, rar, i.e the speech of the Hars, Manjhi, and so forth.'
—G. A. Grierson.

ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস 'কারামবিন্তী' বা 'জমসিমবিন্তী' ও 'ছোটিয়েরে বিন্তী' থেকে জানা যায়। এসব থেকে সূত্র মেলে, কোল বা সাঁওতাল জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে তিব্বত আসাম হয়ে বিহার ও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। এক্ষেত্রে, হাজারিবাগ থেকে মানভূম এবং মানভূম থেকে সাঁওতাল পরগণায় আসে। একটি গান ঃ

"হিহিড়ি-পিপিড়ের বোন জানামলেন,
খজকামানরেবোন খজলেন
হারাতা বুরুরেবোন হারালেন
সাসাঙবে ডারোবেন জাতে না হো।"

অর্থাৎ—(কোল বা হড় জাতি) হিহিড়ি-পিপিড়িতে জন্মেছি, খোজ কামানে আমরা মিলিত হয়েছিলাম, হারাতা পর্বতে আমরা লালিত পালিত হয়েছি এবং সাসাঙ-বেড়েতে আমাদের গোত্র বিভাজন হয়েছিল।[৪]

সাঁওতালদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদও অনেক। হিহিড়ি পিপিড়িতে প্রথমে, চাইচম্পায়, শিলদাই ও পরে শিকারে এদের অবস্থান ছিল। স্থানবাচক নাম দিয়ে মতভেদও অনেক, কেবল চাইচম্পা ছাড়া। গ্রিয়ার্সন সাহেব রিজলি-র (H. H. Risely—'The Tribes and castes of Bengal') উক্তি উদ্ধার করেছেন। তিনি লিখেছেন; "According to Mr. Risely it is clear that a large and important Santal colony was once settled in parganas Chai and Champa in Hazaribagh."[৪ক]

অবশ্য, ডালটন সাহেব দামোদর তীরবর্তী প্রাচীন বীরভূমকে এই জাতির বর্তমান ক্ষেত্রভূমি হিসাবে নির্দেশ করেছেন। দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতালরা নিজেদের উত্তরাগত এবং উত্তর দিকের সাঁওতালরা নিজেদের দক্ষিণাগত বলে থাকে। এটা অনুমান করা হয়, এই নদ-উপত্যকায় তারা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে এসে থাকবে। চাষবাস ও শিকারের উদ্দেশ্যে এবং হিন্দু অগ্রগতির চাপে তাদের সমতলভূমি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সরতে হয়।[৪খ]

যাইহোক, পৌরাণিক পরিচয়, নৃতাত্ত্বিক-প্রসঙ্গ ভিন্ন। বস্তুত আমাদের হাতে প্রামাণ্য নিদর্শন যা আছে, তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এ প্রসঙ্গ থাক। তার চেয়ে আমরা লড়াকু মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ফিরি। বোধ করি, একালের পাঠকদের কাছে এদের যুদ্ধকথা এবং ইংরেজ প্রতিরোধের উল্লেখই প্রাসঙ্গিক।

দুই

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দামিন-ই-কোহতে (বর্তমান সাঁওতাল পরগণা) হাজির হয়। শ্রম, ঘাম, রক্তে তারা জঙ্গল কেটে, পাথর সরিয়ে চাষবাস শুরু করে। সঠিক তারিখ মিলিয়ে বলা যায় না বটে তবে অনুমান করা হয়, ১৭৯০ থেকে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সাঁওতালদের একটি অংশকে বীরভূমের উত্তরাংশ থেকে আনা হয় জঙ্গল সাফ ও বন্যজন্তুদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে।

বুকানন হ্যামিলটনের অপ্রকাশিত দলিল থেকে জানা যায়, ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে, বীরভূমের রাজার অত্যাচারের ফলে তাদের অনেকেই সেখান থেকে সরে আসে। ১৮১৫-১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সাঁওতালদের একটা বড়ো অংশ বীরভূম ত্যাগ করে। ১৮১৮-তে মিঃ সাদারল্যান্ড লক্ষ্য করেছিলেন, সাঁওতালদের একটি অংশ গোদ্দা মহকুমার বনাঞ্চল পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিল। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে, মিঃ ওয়ার্ড দেখেন যে, ঐ মহকুমার উত্তর দিকের প্রান্তভাগে তারা বসতি বিস্তার শুরু করেছিল। কিন্তু ভাগলপুরের কালেক্টর মিঃ ডানবার জানিয়েছেন, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৪২৭টি সাঁওতাল গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫]

১৮৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে, দামিন-ই-কোহ্-র (দামিনিকো) সীমানা নির্ধারিত হয় সারভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানারের নেতৃত্বে। তখন এর আয়তন ছিল ১৩৬৬·০১ বর্গমাইল। এর মধ্যে ৫০০ বর্গমাইলে কোনো পাহাড় ছিল না। আবার এই ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৪৬ বর্গমাইল ছিল জঙ্গল; মাত্র ২৫৪ বর্গমাইল ছিল আবাদযোগ্য জমি। এই সময় বড়লাট বেণ্টিঙ্ক রাজমহলের পশ্চিমদিকে জঙ্গল সাফ করে বসবাস করার জন্য সাঁওতালদের আহ্বান জানালেন। সাঁওতালরা মহানন্দে দলে দলে কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে এসে দামিনিকো-তে ভিড় জমায়। একটি হিসেবে দেখি; ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে যেখানে অন্তত ৪২৭টি গ্রামসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সেখানে ১৮৫১-তে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০০ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে হিসেবটি হলো প্রায় ৮৩ হাজার।[৬]

ইংরেজ সরকার মিঃ পনটেট নামে একজন ইংরেজকে দামিনিকো অঞ্চলের জন্য সুপারিনটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করলেন। তাঁর কাজ ছিল রাজস্ব আদায়।* তাঁর অধীনে চারজন নায়েব সেজোয়াল বা দারোগা ছিলেন "Who used to visit it in order to collect rent and settle disputes about lands."[৭]

ফৌজদারী বিষয়ক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর। তখন থানা ছিল ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। ফলত, প্রয়োজনে সাঁওতাল অধিবাসীদের ভাগলপুর বা বীরভূমে যেতে হতো। কিন্তু দূরত্বের কারণে সেখানে সবসময় তাদের যাওয়া হয়ে উঠতো না।[৮]

তবুও তারা দামিনিকোতেই স্বপ্ন দেখে। অনেক শ্রম স্বীকার করে এখানে এসেছে তারা। ভেবেছে, পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি, পূজা পার্বন পালন করে তারা এখানে বেশ সুখেই থাকবে। মাথার ওপরে তো আছেন তাঁরাই, যাঁরা

* এই রাজস্বের প্রসঙ্গেই কোম্পানি চেয়েছিল লাভ। তাই সাঁওতালদের দামিন-ই-কোহতে বসবাসের উৎসাহ দান করা হয়। ডানবার সাহেব বলেছেন কোম্পানি চেয়েছিল "to ascertain what profits are now derived from the lands."

আরও একটি কারণ ছিল। 'Pious wish' পবিত্র ইচ্ছা হলো যে, সাওতালদের নির্দিষ্ট ধর্মমত না থাকায় তাদের সহজে খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হবে। তাই তাদের প্রতি কোম্পানির ছিল উৎসাহ। (Letters from Dunbar, Collector of Bhagalpur to the Commissioner of Revenue, Bhagalpur. dt 28 Sept, 1836).

সর্বসুখের জন্য দায়ী থাকবেন—গ্রামমাঝি, পারানিক, পারগানা ও দেশমাঝি। সুতরাং অসুবিধে হবে না ভেবেই এখানে তারা দলে দলে চলে এসেছে।[৯]

দামিনিকোতে সাঁওতালরা বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু সাঁওতালদের ভাগ্যে এই সুখ বেশি দিন সইল না। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে ব্যবসায়ী জমিদার ও মহাজনদের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়লো।[১০] শোষণ-পীড়ন বাড়লো। শুরু হলো অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা। ফলে তাদের সুখ তিরোহিত হল।

দ্বিতীয় পর্ব ॥

···অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গ···

সাঁওতালদের নিভৃত-আর্ত, ক্ষোভ, রোষ, অসন্তোষ সর্বোপরি, গণজাগরণের ঘটনামানতার পেছনে অর্থনৈতিক দিকটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ একে বলেছেন 'economic grievances'।[১১] শোষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখবো যে, বাঙালী মহাজন* আর সবার ওপরে ইংরেজ সরলমতি সাঁওতালদের ওপর যে শোষণ, পীড়ন শুরু করেছিল তা বর্বরতারই নামান্তর। দারিদ্র্যপীড়িত সাঁওতালগণ একসময়ে রক্তের শেষ বিন্দুটি দিয়ে শোষকের চাহিদা পূরণ করে এসেছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত সাঁওতালগণ নিরুপায় হয়ে যখন নিজেদের নিঃশেষ অধিকারের উৎস খুঁজে পেতে চাইলো ও জীবন জটিলতাকে উপলব্ধি করতে শিখলো ; তখনই সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে উপেয় পথটি বিদ্রোহ বলেই ভেবেছিল। আর, আত্মসংবিৎ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শক্তি সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ নামক পথটি বেছে নিল, একসাথে বহুজনে, গণমনে।

এক

সাঁওতালরা দামিনিকো-তে এসে বন্য জন্তু ও শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যকে আবাসভূমি হিসাবে গড়ে তোলে। জঙ্গল হাসিল করে শস্য শ্যামল কৃষিক্ষেত্র তৈরি করলো। কোম্পানি প্রথমে তাদের উৎসাহিত করে। খাজনার কথা উচ্চ্যবাচ্য করলো না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কোম্পানির 'পুঁজিবাদী' চেহারা স্পষ্ট হয়। কোম্পানির তাঁবেদার জমিদার শ্রেণীও পিছিয়ে রইলো না। ইতিমধ্যে সীমানা নির্ধারিণ হয়েছে। পনটেটও নড়ে চড়ে বসেন। কোম্পানির আয় চাই। সুতরাং খাজনা আদায় শুরু হয়। প্রথমে নামমাত্র। পরে আরো। উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। খাজনার বহরটার দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

চিত্রটি এরূপ ;[১২]—

সময়কাল	খাজনা সংগ্রহ
১৮৩৭-৩৮	৬,৬৮২ টাকা
১৮৩৮-৩৯	৭,৭৯৮ "
১৮৩৯-৪০	১০,৬৪৪ "

* "The Mehajuns have committed heramis (treachery) pap (sinful crimes) and all have acted unjustly".—দ্র. Judicial Proceedings No. 158 dt. 14.2.1856.

সময়কাল	খাজনা সংগ্রহ
১৮৪০ ৪১	২০,০৭৪ ,,
১৮৪১-৪২	২০,৯৯৭ ,,
১৮৪২-৪৩	২২,৩৭২ ,,
১৮৪৩ ৪৪	২৫,৪৫০ ,,
:৮৪৪-৪৫	২৮,০০২ ,,
১৮৪৫-৪৬	৩২,৪৩০ ,,
১৮৪৬-৪৭	৩৬,৪০৭ ,,
১৮৪৭-৪৮	৩৯,৯০৫ ,,
১৮৪৮-৪৯	৪০,৯৪৭ ,,
১৮৪৯-৫০	৪৩,৭২৪ ,,
১৮৫০-৫১	৪৭,৬৬৫ ,,
১৮৫১-৫২	৫০,১৬০ ,,
১৮৫২-৫৩	৫১,৮২৫ ,,
১৮৫৩-৫৪	৫৩,৪৫৫ ,,
১৮৫৪-৫৫	৫৮,০৩৩ ,,

এটা অনুমেয়, ষোল-সতেরো বছরের মধ্যে সাঁওতাল-কৃষকদের ওপর কী পরিমাণ খাজনা বাড়িয়েছিল কোম্পানি। এতদিন যারা জঙ্গল পরিষ্কার করে সমতলে আস্তানা গড়ে তুলেছিল, খুশিমতো চাষ করছিল ; সীমানা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আদেশ জারী হয় খাজনা প্রদানের। আর, তার পরিমাণ কিরূপ বেড়ে চলেছিল ; তা প্রাগুক্ত চিত্রে সুস্পষ্ট। এটা বলা বাহুল্য, খাজনা আদায় ও জোর জুলুমের ক্ষেত্রে জমিদারেরা ছিল ইংরেজের সহযোগী, দোসর। এর ওপর ছিল মহাজনদের অত্যাচার। এদের হাত থেকে সাঁওতাল কৃষকদের নিস্তার ছিল না। ছিল না এমন উদাহরণ অনেক। দু'একটা প্রসঙ্গ টেনে আনি। যেমন, বর্ষার দিন। সাঁওতালদের কষ্টের সময়। এমন দিনে, মহাজনদের দেখা মিলতো। অনেকটা বন্ধুর মতোই। তারা ঋণ দিত। কিন্তু যে অর্থ বা শস্য ধার হিসাবে দিত, তা উসুল করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের রাখঢাক ছিল না ; ষোল আনাই উসুল চাই ; সুদের ওপর সুদ। নিরক্ষর সাঁওতাল-কৃষক তার হিসেব বুঝতো না, বুঝতো না মহাজনের ফন্দিফিকির। ফলকথা, সারাজীবন ধরে তাদের ঋণের জের বহন করতে হতো।[১৩] কায়িকশ্রম দিয়ে, আমৃত্যু শ্রমিক-সেবক হয়ে কিংবা দাসত্ব করেও তা শোধ হতো না।

'ক্যালকাটা রিভিউ'[১৪] লিখেছে, একজন সাঁওতাল কৃষক ঋণ নিলে তার ঋণের জন্য জমির ফসল, লাঙ্গল, বলদ এমন কি নিজেকেতো বটেই তার পরিবারকেও হারাতে হতো। আর ঋণ পরিশোধ করলেও তার ঋণের বোঝা পূর্বের মতোই থেকে যেত। মহাজনদের সুদের হার ছিল ততোধিক ; শতকরা পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো টাকা।

এই প্রসঙ্গে হাণ্টার বলেছেন ;—অসহায় মানুষগুলোর কোনো সম্বল ছিল না। না জমি, না ফসল। ফলে ঋণ কোনোদিনই শোধ হতো না। ধরা যাক, পিতার

মৃত্যুতে পুত্র মহাজনের ঋণ নিল। পরদিন থেকে তার সমগ্র পরিবারটিকে মহাজনের বাড়িতে কায়িক-শ্রম দিতে যেতেই হতো। ঋণের সুদ ছিল শতকরা তেত্রিশ টাকা। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে ঋণের বোঝা স্ফীত হতো। শোধের প্রশ্নই ছিল না। তাই অধমর্ণ সাঁওতালটির মরেও নিস্তার ছিল না, তার ঋণ বংশধরের ওপর চেপে যেত। বলাবাহুল্য, অধমর্ণ সাঁওতাল মহাজনের নাগপাশ থেকে যখন মুক্তি চাইতো তখন মহাজনের অত্যাচার তো ছিলই, তার ওপর মিথ্যা মামলায় সে জড়িয়ে পড়তো।[১৫]

নরসিং মাঝি ও কুদরু মাঝি কমিশনারের কাছে মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে ১৯শে আগষ্ট ১৮৫৪-তে যে নালিশী পত্র লেখেন, তাতে তাদের মনোভঙ্গি লক্ষণীয়। তাঁরা নালিশ জানিয়ে বলেছেন ; মহাজনরা ঋণ আদায়ের নামে বাড়িতে চড়াও হয়ে ছাগল, মুরগি নিয়ে চলে যায়। চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার ঋণের মিথ্যে খত লিখিয়ে নেয়। মামলা দায়ের করে। অথচ কোনো সাঁওতাল মহাজনের বাড়িতে গেলে তার নামে চুরি, ডাকাতির অভিযোগ আনে, অন্যায় অপবাদ দেয়। এই সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, সুপারিনটেনডেণ্ট সকলের কাছে নালিশ জানিয়ে কোনো ফল হয়নি। ঐ পত্রে তাঁরা ক্ষোভ জানিয়ে বলেছেন : আমরা জঙ্গল হাসিল করে বসতি গড়ে তুলেছি। এখন যা অবস্থা, তাতে ঐ স্থান ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। সরকার আমাদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা না নিলে আমরা কি করব ? আমরা অন্যত্র চলে যাব। আমাদের প্রার্থনা, কমিশনার সাহেব যথার্থ অনুসন্ধান করে মহাজনদের অত্যাচার থেকে আমাদের উদ্ধার করুন এবং মহাজনদের অন্যত্র সরিয়ে আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।[১৬] এ এক ভীতি বিভোর, মর্মান্তঃ-সঞ্চারী আবেদন।

দুই

দুষ্ট মহাজন সম্পর্কে সাঁওতাল নেতা সিদু ও কানু ইংরেজ শাসকদের অনেক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সিদু ধরা পড়ার পর মিঃ ইডেনের কাছেও অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর অনুভূতি আরও তীব্র, তীক্ষ্ম। তিনি বলেছেন, এই মহাজনগুলো এক টাকা দিয়ে, সুদ নেয় পাঁচ টাকা। খুশিমতো মূল্যে ফসল কেনে। কেউ আপত্তি করলে কান মুলে দেয়, মারধোর করে। এমনকি, সরকারের তরফে নায়েব, সেজোয়ালরাও খাজনা আদায় করতে এসে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা সেলামী আদায় করে।[১৭]

কানুও ধরা পড়ে ব্রিগেডিয়ারকে ঐ একই রকম অভিযোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মহাজন এক পয়সার বিনিময়ে কুড়ি পয়সা পর্যন্ত আদায় করে। শুধু কি তাই। সাঁওতাল কৃষক উৎপন্ন সামগ্রী নিয়ে বাজারে যেত বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। মহাজনরা সে সব কিনে নেবার জন্য অপেক্ষা করেই থাকতো। মজার বিষয় হলো এই, সাঁওতালদের আনীত শস্য কিনতো বড়ো বাটখারা 'কেনারাম' দিয়ে। আর, যখন কিছু বিক্রি করতো তখন ছোট বাটখারা 'বেচারাম' ব্যবহার করতো। সাঁওতালরা এর নাম দিয়েছিল 'বড়ো বউ', ও 'ছোটো বউ'। তাছাড়া, মহাজনরা অসময়ে ঋণ দিয়েছে এই অজুহাতে ফসল কাটার সময় গরু ও ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ঋণগ্রস্ত সাঁওতাল কৃষকের বাড়িতে হাজির হতো। এমনকি, পাথরের টুকরোতে

সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে নিয়ে যেত ; এ দিয়ে বোঝানো হতো সিঁদুর ছোঁয়ানো পাথরই ঠিক ওজনের প্রতীক। এ হলো দুর্লভ কৌতুক। এতে উঠ্তি ধনবান সম্প্রদায়ের লালসা বিকৃতির চিত্র ফুটে ওঠে। 'ক্যালকাটা রিভিউ'[১৯] জানিয়েছে ঃ কেবলমাত্র জমিদার মহাজন নয়, তার গোমস্তা, সরবরাহকার সরকারি পিয়ন, পুলিস রাজস্ব আদায়কারী নায়েব সেজোয়াল এবং আদালত কর্মচারিগণ মিলে একত্র সাঁওতালদের ওপর শোষণ, নির্যাতন করেছিল। সম্পত্তি হরণ, প্রহার, নানাপ্রকার উৎপীড়ন তো ছিলই। সাঁওতালদের পরিশ্রমের ফসল নষ্ট করার জন্য জমিতে ঘোড়া, গাধা পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হতো। নানাপ্রকার মুচলেকা ও দাসত্বখত লিখিয়ে নেওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যারা দাসত্ব স্বীকার করতো না, তারা আইনের অনুশাসনে সর্বস্বান্ত হতো। কেউ পালিয়ে গেলে নিষ্ঠুর শোষক পেয়াদা পাঠিয়ে সেই পলাতকের ব্যবহার্য সকল জিনিসই কেড়ে নিতো। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে ;——"দুরাচারী স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড় হইতে শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখে বিনষ্ট করিয়াছে।"[২০]

তিন

এখানে এইমাত্র স্পষ্ট করে নেওয়া যায়। শুধু মহাজন নয়। রাজকর্মচারী, রেলওয়ের ইংরেজ ঠিকাদার নানারকম অত্যাচার চালাতো। মিঃ টমাস নামে এক ইংরেজ কর্মচারী সাঁওতাল পল্লীতে ঢুকে মেয়েদের শ্লীলতা হানি করতো। আবার খুশিমতো সাঁওতালদের ভেড়া, ছাগল, মুরগি প্রভৃতি ছিনিয়ে নিতো। প্রতিবাদ করলে জেলের ভয় দেখাতো। ভাগলপুরের অস্থায়ী কমিশনারের একটি প্রশাসনিক প্রতিবেদনে[২১] জানা যায় যে, উপজাতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী হওয়ার মূলে ছিল তাদের মধ্যে অসন্তোষ-ভাব (State of dissatisfaction)। অবশ্যই এই অসন্তোষের কারণগুলি সূত্রবদ্ধ করা যায় এইভাবে ;—

১. জমিদার, মহাজনদের অত্যাচার ;

২. এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নায়েব, সেজোয়াল বাহিনী ;

৩. এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্মচারীরাও জড়িত ;

৪. সরকার তরফে এসব ক্ষেত্রে প্রতিরোধের জন্য নজর কম দেওয়া হয়েছে।

বলে রাখা ভালো, কমিশনার বিডওয়েল সাহেব এরকম আংকিক হিসেব দেননি ; কিছুটা আভাসে ইংগিতে বলেছেন বটে। তবে অত্যাচারীদের তালিকায় রাজকর্মচারী, কোম্পানির ইজাদাররাও ছিল। এবং প্রশাসনিক উদাসীনতা সম্পর্কেও প্রচ্ছন্ন ইংগিত ছিল।

সাঁওতালরা একসময় ইংরেজদের জানিয়েছিল ; কাজে তাদের আনন্দ। তারা মূলত কৃষক। তাদের থাকা ও খাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটুকু করলে ইংরেজদের বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই।[২২] যাইহোক, এই আদিবাসী জনসমাজ কখনই কৃপা চায়নি। দেহে তাদের অটুট শক্তি। পরিশ্রমে তারা পিছুপা ছিল না। এরা কষ্টসহিষ্ণুও বটে। খেতখামারে, রেললাইনে যেখানে কাজের ডাক এসেছে সেখানেই তারা অন্তর গরজে ছুটে গেছে।[২৩]

কিন্তু সমস্যা ছিল অন্যত্র। ইংরেজরা সাঁওতালদের আবেদনটুকু রক্ষা করতে করতে পারেনি। তাদের জীবনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে আলো জ্বালতে পারেনি ; উপরন্তু অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল, আঘাতের উপর আঘাত।

কেবল বলতে চাই, সাঁওতালেরা প্রথমে ইংরেজ বিদ্বেষী ছিল না। কিন্তু সরকারি প্রশাসন তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই একজন ইংরেজের সত্যসন্ধ উপলব্ধি তুলে ধরি। তিনি বলেছেন ;—"It proves that the hostile feeling of the tribe arose, not from an animus against Europeans in general, but merely against Government and the police." [২৪]

কথার পিঠে উঠে আসে কথা। ঐতিহাসিকের কথা। বলেছেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার। "it was primarily, perhaps mainly due to economic causes and there was no anti-British feeling at the beginning of the outbreak." অতএব গর্জে ওঠে সাঁওতাল কৃষক, মুষ্টিবদ্ধ হাত, শক্ত চোয়াল, তীরের ফলা শানিত হয় তখনই, যখন "they turned against the Government when they found that instead of remedying their grievances, the officers were more anxious to protect the oppressors from their wrathful vene-geance."[২৫] কিন্তু গণ অসন্তোষ যে অর্থনৈতিকতার প্রশ্নে তীব্র, তীক্ষ্ম, সিক্ত। এই সম্যক উপলব্ধি যখন ইংরেজরা করলো, তখন কালবেলা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটে যায়। কিন্তু সে আর এক ধাপ পরের কথা।

তৃতীয় পর্ব ॥

···গণযুদ্ধ··

বাঙালী মহাজন, কুশীদজীবী ও ইংরেজদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের গণসংগ্রাম শুরু হয়। মনে করতে বাধা নেই, যে অর্থনৈতিক বিড়ম্বনায় জাতির অন্তর্গূঢ় প্রেরণা স্ফুট-বাক্ হয়ে উঠতে পারলো না ; যা গভীর হৃদয়-ধর্মে আঘাত করে তা হতে মুক্তি ছিল আসল লক্ষ্য। বস্তুত মর্ম-মথিত কথা হলো এই ;—"বাঁচার জন্য তাদের মূল দাবি ছিল জমি ও মুক্তির।"[২৬]

এক

এখানে বলার থাকে, সাঁওতালরা প্রথমে আবেদন নিবেদনের মধ্যে থেকেছে। শেষে উপায় না দেখে তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিল। পরে সম্মুখ সমরে।

মহাজনদের মিথ্যা মামলা ও অতিরিক্ত দাবির ফলে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। যারা রইলো, তারা ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, উত্তেজিত অবস্থায় দিনযাপন করছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দামিনিকোর সুপারিনটেনডেণ্ট পনটেট সাহেবকে সাঁওতালদের গণ অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট দিতে বললেন। পনটেট সাহেব এক প্রতিবেদনে জানালেন যে, মহাজনরা চড়াহারে সুদ নেয় এবং ওজনে ঠকায়, সত্য বটে। এ ব্যাপারে সাঁওতালদের ক্ষোভের কারণটুকুও স্বীকার করলেন। বস্তুত,

এই স্বীকৃতির পথ বেয়ে কোনো সুরাহা হলো না। তাদের অভিযোগের কোনো বিচারও না। তাদের ক্ষোভের কারণগুলি দূর করতে সরকার যখন মনোযোগী হলো না, তখন তারা নিজেরাই মহাজনদের ওপর প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়।

১৮৫৪ সাল। লক্ষ্মীপুর সাসানের পরগানাইত বীরসিংহ মাঝি বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। মহাজনদের কাছে প্রথমে তাঁর আবেদন ছিল প্রত্যক্ষ ও গভীর। তিনি তাদের কাছ থেকে সহৃদয়-মনোভাব প্রত্যাশা করেন। কিন্তু তারা বিপরীত স্বভাব-ধর্মের মানুষ। ফলে ক্ষুব্ধচিত্ত বীরসিংহ আক্রমণ চালান, লুণ্ঠন শুরু করেন। ঐ সালের মে-জুন মাসের মধ্যে দামিনিকোর ছ'-জন ধনী মহাজনের বাড়ি লুণ্ঠিত হয়। এর ফলে, মহাজনরা শঙ্কিত হয়। মহাজনরা পাকুড় রাজার কাছে আবেদন জানায়। তাঁর দেওয়ান জগবন্ধু রায় 'শ্রেণীস্বার্থে' সাড়া দিলেন। তিনি বীরসিং মাঝি ও তাঁর অনুচরদের কাছারি বাড়িতে আটক রেখে অপমান করেন। জরিমানা চাইলেন। আরও ঘটনা ঘটে। এই সময় গোচু[২৬ক] (গোকু) নামে এক সম্পন্ন সাঁওতালকে মহাজনদের মিথ্যা অভিযোগে মহেশ দারোগা গ্রেপ্তার করে ও নির্মম ভাবে চাবুক মারে। এ ঘটনায় সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গোকু চ্যালেঞ্জ জানালেন ;—"আমরা দেখতে চাই, শয়তান দারোগা শান্তিকামী সাঁওতালদের বাঁধবার-মতো দড়ি কোথায় পায় ?"[২৭]

সাঁওতালদের অসহিষ্ণু প্রাণাবেগ সকল অবরোধ চূর্ণ করে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তপ্ত প্রবাহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হলো মাত্র। 'ক্যালকাটা রিভিউ' স্পষ্টই লিখেছে—"Their endurance had reached its maximum and while the spirits of the people were in this condition, it needed but a spark to kindle the fire."[২৮]

ভাগলপুরের সেসন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৫৪ সালের ২৪শে জুন তারিখে কমিশনারকে এক রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, সরলমতি সাঁওতালরা ডাকাতি করছে ; এটা আশ্চর্যের। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বাঙালী মহাজনদের কথা বলছে বটে, তবে এরকম মনোভাব যদি সাঁওতালরা পোষণ করতে থাকে ; অচিরেই আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ভাগলপুরের কমিশনার ব্রাউন সাহেব সাঁওতালদের রক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। পনটেটকে মুন্সেফের ক্ষমতা প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। তদন্তের নির্দেশ দেন। সেইসূত্রে কালেক্টর বিষয়টি অনুধাবন করে সাঁওতালদের সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে থাকার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে, তিনি আরও কড়া সুরে বলেন যে, নির্দেশ অমান্য করলে প্রতিদিন পাঁচ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। এসব ১৮৫৫ সালের গোড়ার কথা। কিন্তু এতে সুরাহা কিছু হলো না। নিত্য নতুন বিপত্তি বেড়ে যায়। সাহেবদের দপ্তরে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের অভিযোগ পত্রই শুধু জমা হয়। বন্ধন-মুক্তি আর ঘটে না। নিষ্ফল রোদন।

দুই

ইংরেজ, জমিদার ও মহাজন সাঁওতালদের ওপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছিল

প্রথমাবধি, তার প্রতিবাদস্বরূপ, অশুভের শেষ চেয়ে সর্বান্তঃকরণে গণযুদ্ধের ডাক দিলেন ভগনাডিহির এক পরিবারের চার সন্তান ; সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব* । তবে উদ্যম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে বরণীয় সেনাপতিদ্বয় হলেন সিদু ও কানু। যাইহোক দেবতার নামে চারভাই যুদ্ধে নেমেছেন। এবং গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছেন। দেবতা মারঙ্গবুরু যে পুতগ্রন্থ (অদৃশ্য-লিখন) সিদুর হাতে দিয়েছেন, তা গ্রামবাসীর হাতে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে যুদ্ধে আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। সরকারি রিপোর্টে দেবতার নামে যুদ্ধ প্রচারের কথা জানা যায়। এই রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, নারায়ণ মাঝির পুত্র সিদু ও কানু এই বলে প্রচার করেছেন যে, তাঁদের গৃহে দেবতা আবির্ভূত হয়েছেন। দেবতার ইচ্ছা, সাঁওতালরা সাহেব ও মহাজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ুক। তিনি সাঁওতালদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবেন। সাহেবদের গোলা-গুলিতে তাদের ক্ষতি হবে না। মহাজনদের অত্যাচার আর সাহেবদের অন্যায় নিয়ম-কানুনের জন্য তাদের শাস্তি পেতেই হবে। এদেশ সাহেবদের নয়। দেবতার নামে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেছিলেন ঃ "the Thakoor will fight. You all come near the Thakoor and fight."[২৯]

সিদু ও কানুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাঁওতাল জাগরণ চরম পর্যায়ে ওঠে। ধর্মের এক অভিনব বাতাবরণে একটি কাহিনী বিবৃত করে জনমানসে নাড়া দিলেন যুদ্ধের এক অননুভূত স্বাদে। কাহিনীটি অলৌকিক। আমাদের কুতুহলতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই তুলে ধরা গেল। বর্ণনা এরূপ,—

দেবতা "প্রথমে তিনি আবিভূর্ত হলেন আকাশ থেকে নেমে আসা মেঘের আকারে, তারপর একটি অগ্নিশিখার রূপে, তৃতীয়বার তাঁর আবির্ভাব ঘটল আবৃত মস্তক এবং এক মূর্তির রূপ ধরে, মুখখানি তার ঘন কুয়াশায় ঢাকা ; চতুর্থবার তাঁর প্রকাশ ঘটল পূর্ণ সূর্যালোকে এক ছায়ামূর্তি রূপে, কোন পার্থিব ছায়া সেখানে পড়ে না ; পঞ্চমবারে তাঁর অভ্যুদয় হ'ল ভূগর্ভ থেকে হঠাৎ উত্থিত এক পর্বতের মত ; ষষ্ঠবার তিনি একের পর এক শালতরুর মত, কোন গাছ সেখানে জন্মায়নি ; এবং সর্বশেষে তিনি দেখা দিলেন সাঁওতালের মত পোশাক পরে এক শ্বেতাঙ্গের মূর্তি ধরে, কোমরে তাঁর একখণ্ড মাত্র বস্ত্র।"[৩০]

অন্যত্র ;[৩১]

রাত্রিকাল। সিদু ও কানু গৃহে বসে চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় ঠাকুর তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি শ্বেতকায় হলেও সাঁওতালী পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। তাঁর প্রতি হাতে দশটি করে আঙুল। হাতে ছিল সাদা রঙের বই। তাতে তিনি

বয়সের ক্রম অনুসারে কানু, সিদু, চাঁদ, ভৈরো বা ভৈরব। Judicial Pros. No. 83 dt. 30.12.1855. তে জানা যায় কানুর বয়স ৩৫, চাঁদ মাঝির ৩০ এবং ভৈরব মাঝির বয়স ২০।

সিদুর বয়স জানা না গেলেও কানু ও চাঁদ মাঝির বয়সের ফারাকের মধ্যে সংখ্যাটি নিহিত। তবে অনুমান করা যেতে পারে, সিদুর বয়স ৩২-৩৩ হওয়াই সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে সিদুর চেহারার বর্ণনা দেওয়া যায়। "Seedoo is tall, long haired, and rather light in color for a sonthal." দ্র, Judicial Pros. No. 28. dt. 25.10.1855.

যেন কী লিখছিলেন। বইটি ও বিশ টুকরো কাগজ দুই ভাইকে দিয়ে তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। কিছু পরে দু'জন মানুষ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ঠাকুরের নির্দেশ ব্যাখ্যা করে অন্তর্হিত হলেন। এরকম এক সপ্তাহ ধরে রোজই ঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন।

এ হয়তো তাঁদের কল্পনা। কিন্তু মূর্ত। সিদু ও কানু সাঁওতাল জনসমাজে কল্পনার দ্যুতি ছড়িয়ে দিলেন। কল্পনা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জনসমাজে তাই সাড়া জাগে।[৩২] তাই সিদ্ধান্ত হয়, গণসভায় ভগনাডিহিতে। ঐতিহাসিক মিলনের ৩০শে জুন, ১৮৫৫-য়। এর জন্য সকল গৃহে শালবৃক্ষের শাখা* প্রেরণ করে তাদের ডাক দেওয়া হয়। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, 'their signal for war.'[৩৩] যুদ্ধের সংকেত ধ্বনি দিয়ে গোটা সাঁওতাল সমাজকে সচল, সক্রিয় করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য।

আমরা ঐ ইংরেজ লেখককে গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ তাঁর মন্তব্য যে গ্রন্থে** পাই, তা ঘটনার এক যুগের মধ্যে রচিত। এবং তাঁর অভিব্যক্তি সাঁওতাল জনসমষ্টির প্রতি সম্ভ্রম-বাগ্ বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। সুতরাং বলা চলে, শাল শাখা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল—**যুদ্ধের** সংকেত দেওয়া। কারণ, ১. পরিশ্রমী, শান্তিকামী মানুষরা বঞ্চিত অধিকার ফিরে পেতে একত্র হয়েছিল।

২. নির্যাতিত সাঁওতাল সমাজ সরকারের অস্তিত্ব পুলিসী ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছিল।

৩. মহাজনদের শোষণ, পীড়ন, দলন নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্তি পেতেই তারা গণ সম্মিলনে অংশ নেয়। এবং **গণযুদ্ধের** ডাক দেয়।

এরপর চরমপত্র দেওয়া শুরু হল। পত্রের ছত্রে ছত্রে ইংরেজ শাসকের সততা ও নিরপেক্ষতা বিষয়ে বিশ্বাসের শিথিলতা দৃঢ় ব্যক্ত হয়েছে। এতে তাদের বিরোধী মনোভঙ্গি স্পষ্ট। আর তাতেই দুর্যোগের প্রত্যক্ষ সংকেত। সাঁওতাল নেতা কির্তা, ভাদু, সুন্নো মাঝি সিদুর নির্দেশে ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূমের কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট, দীঘি ও টিকরি, রাজমহল প্রভৃতি থানার দারোগাদের ও স্থানীয় জমিদারদের চরমপত্র লিখলেন। পনেরো দিনের মধ্যে তাদের জবাবও চাওয়া হলো। ঐ পত্রে সাঁওতাল নেতারা তাঁদের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠার দীপ্ত ঘোষণা[৩৪] করলেন।

সাঁওতালদের সুতীব্র বেদনা, প্রতিহিংসার আগুনে তেজোদীপ্ত হয়েছে। অত্যাচার ও আঘাতের বিরোধিতায় তারা উদ্দাম। বলা বাহুল্য, সিদু ও কানু সাঁওতালদের জীবনযন্ত্রণার তিক্ততম বোধকে দুর্বার করে তুলেছেন। তাই ভগনাডিহির প্রান্তরে তাঁদের অমর সিদ্ধান্ত নতুন পথে চালিত করেছে। একটি পত্রিকার ভাষ্য :

"ভারতীয় ইতিহাস মেঁ ৮ আগস্ট ১৯৪২ কা জো মহত্ত্ব হেঁ, ওহী মহত্ত্ব ৩০

শালগাছ 'সারিসারজম'

* (Saltree the truth)

** E. G. Man, Sonthalia and the Sonthals, 1867.

জুন ১৮৫৫ ক্যা হ্যায়। ৮ আগস্ট ১৯৪২ কো প্রসিদ্ধ 'ভারত ছোড়ো,' প্রস্তাব স্বীকৃত হুয়া থা। ঠিক উসী প্রকার বিহার রাজকে সন্তাল পরগণা জিলেকে অন্তর্গত্ রাজমহল ক্ষেত্রকে ভাগনাডি গাঁওমে ৩০ জুন ১৮৫৫ কো দশ হাজার সন্তালোকে বিচ্ সন্তাল নেতা সিদোনে এক প্রস্তাব দ্বারা য়েহ্ ঘোষিত্ কিয়া থা আংরেজ উন্‌কি ভুমিকো ছোড়্ দে।"[৩৫]

ফল কথা, বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের সমর বাহিনী সশস্ত্র তৈরি হয়। প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৎপর হয় বটে কিন্তু তাতে উত্তাপ বেড়ে যায়। সাঁওতালদের দুর্মর ক্রোধের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা স্পষ্ট। তাদের অন্তরে রয়েছে সিদু ও কানুর ভাবপ্রেরণা ও আদর্শের দীপ্তি। ফলত, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে অন্তত শোষণ মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে।

তিন

ক্ষুব্ধ সাঁওতালরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেমেছে। প্রথমে তারা আড়ালে-আবডালে সংগঠন পরিচালনা করছিল বটে তবে ক্রোধ এমনই জিনিস চেপে রাখা যায় না। বিদ্রোহীরাও পারেনি। পাঁচক্ষেতিয়ায় দিঘি থানার দারোগা মহেশ দত্তকে দেখে সিদু ও তার সঙ্গীসাথীরা ফুঁসে ওঠেন। সিদুর সঙ্গে দারোগার বাদানুবাদ হয়, সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষের জের স্বরূপ সিদু মহেশ দারোগাকে হত্যা করেন। দারোগার সঙ্গে ছিল মানিকরাম মহাজন। কানু তাকে হত্যা করেন। এই সংঘর্ষে পুলিসপক্ষের কয়েকজন বরকন্দাজ আহত ও নিহত হয়।

সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ আছে এই তথ্য।[৩৬] এতে অবশ্য তিনটি তথ্য ধরা পড়ে।

১. দারোগার প্রতি সিদুর ব্যক্তিগত রোষ ছিল না ;

২. দারোগা মহেশ দত্ত সাঁওতালদের প্রতি বিরূপ ছিলেন ; মহাজনদের মদত দিতেন এবং জোরজুলুম করতেন ;

৩. সিদুর এহেন আচরণ প্রতিশোধাত্মক মনোভাব থেকেই এসেছে এবং নেতৃত্বের পদে আসীন থাকার কারণে এটা তাঁকে করতে হয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডই সাঁওতাল সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সূচনা। এই ঘটনার পর ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ, নায়েব-সেজোয়াল, মহাজন, জমিদার প্রভৃতির সাঁওতাল যোদ্ধাদের টার্গেট হয়ে ওঠে। তারা সর্বত্রই ত্রাস সৃষ্টি করে। কানুর নেতৃত্বে বারহেত বাজারে পঞ্চাশ জন মহাজন নিহত হয়। সিদু রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের আবাসস্থল শ্রীকুণ্ডু আক্রমণ করেন। তারা অবশ্য পালিয়ে যায়। রেলওয়ে কণ্ট্রাকটরদের কলোনি পলসা আক্রান্ত হয়। তাদের বাঙলোগুলির ধ্বংসসাধন করা হয়। টমাস আহত হলেন। তিনি কোনো মতে বেঁচে গেলেও তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা নিহত হন। এই সময় ঔরঙ্গাবাদ ও রাজমহলের নীলকুঠিগুলি আক্রমণ করা হয়। গোদ্দা অঞ্চলে অত্যাচারী নীলকর ফিজপ্যাট্রিকের ওপর গোক্‌ক তীব্র আক্রমণ চালান। কয়েক সহস্র সাঁওতাল এতে অংশ নেয়। তারা অম্বর পরগণার অন্তর্গত লিটিপাড়া

লুণ্ঠন করে। এই সময় ঈশ্রীভগৎ ও তিলকভগৎকে হত্যা করে। সাঁওতাল গণমনে যে 'হুল' (বিদ্রোহ) জেগেছে তারই প্রকাশ ঘটে হিংসাশ্রয়ী কর্মকাণ্ডের মধ্যে। এসময় অবশ্য বিদ্রোহীদের দলপুষ্ট [৩৭] হয় হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনে।

এই সময় বিদ্রোহীরা পাকুড়ের রানী ক্ষেমাসুন্দরীকে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার আহ্বান জানায়। তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে রাজবাড়ি লুণ্ঠিত হয়। গ্রামও ধ্বংস করা হয়। ভাগলপুরেও ত্রাস সঞ্চার হয়। ইংরেজ কর্মচারীরা ভয় পেয়ে স্থান ত্যাগ করার জন্য নৌকোয় উঠে পালায়।[৩৮] পাকুড় আক্রমণকালে বিদ্রোহীরা মহাজন দীনদয়ালের বাড়িও আক্রমণ করে। দীনদয়াল পুকুরে স্নান করার সময় সাঁওতালরা হঠাৎ উপস্থিত হলো সেখানে। তারা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটতে কাটতে চিৎকার করে বলেছিলঃ এই হাতেই তুমি ক্ষুধার্ত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে।[৩৯] এরপর বিদ্রোহীরা দীনদয়ালের মাথা কেটে ফেলে।

এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘোষণা করে এটা তাদের দেশ, এখান থেকে সাহেবদের তাড়াবেই। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতে থাকে। ডাক চলাচল বন্ধ করে দেয়। আরও ঘোষণা করলোঃ সরকারকে আর খাজনা দেওয়া নয়। খাজনা আদায় করবেন সিদু ও কানু। বিচারও তাঁরাই করবেন। ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁদের ঘোষণায় অনেক কিছু বলা হলো। এবং এসব দেবতার নামেই প্রচারিত হলো।[৪০]

চার

সিদু ও কানু বিদ্রোহের যে বহ্নিকণা সৃষ্টি করলেন, তা সাঁওতাল জনচিত্তে দাবানল সৃষ্টি করলো। বারহেত দখলের পরই সাঁওতালরা দলে দলে সিদু-কানুকে অভিনন্দন জানালো এবং তাদের অবিসংবাদিত নেতা বলে মেনে নিল। সিদু-কানু বুঝতে পারলেন এরপর ইংরেজের পুলিস ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামতেই হবে। তাই তাঁরা সাঁওতাল যুদ্ধবাহিনী গড়ে তোলেন। এই সময় রেলপথ তৈরি হচ্ছিল, সাঁওতাল জোয়ান ছেলেরা অনেকেই কাজে গিয়েছিল। তাদেরও ডাক দেওয়া হলো। যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত করা হলো।[৪১]

অন্যদিকে, ভাগলপুরের কমিশনার সেনাপতি বারোজকে প্রেরণ করলেন সাঁওতাল যোদ্ধাদের দমনে। তিনি প্রথমে কিছুটা সুবিধে করতে পারলেও ১৬ই জুলাই, ১৮৫৫ তারিখে পীরপাঁইতির যুদ্ধে পরাজিত হন। এতে একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক, কয়েকজন দেশীয় অফিসার ও পঁচিশজন সিপাহী নিহত হয়।[৪২]

এই সময়, সাঁওতাল সৈন্যদের গেরিলাকৌশলে আক্রমণ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদ ভাষ্য এরূপ ;—আক্রমণ নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হচ্ছে, ভয়ানক আকার ধারণ করছে। প্রশাসনে অচলাবস্থা। এই অবস্থার ফলে দেশীয় প্রজাদের কাছে সরকারের প্রতিপত্তি অত্যন্ত কমেছে। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ প্রশাসন যন্ত্রকে এতটা দুর্বল মনে হয়নি।[৪৩]

আগেই বলেছি, সাঁওতালদের যুদ্ধ ঘোষণা ও অভিযানের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয় সরকারের তরফ থেকে। এরজন্য রণনিপুণ সেনাপতিদের নিযুক্ত করা হলো।

ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রিচার্ডসন ৯.৭.১৮৫৫ তারিখে এক রিপোর্টে সরকারকে জানালেন, সাঁওতালদের অগ্রগমনের সংবাদ। তারা যে সিংভূম ও অন্যান্য জেলার সাঁওতালদের সহযোগিতায় দেশের কর্তৃত্ব হাতে নিতে চাইছে এমন আশংকার কথাও লিখলেন বটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর জন্য তিনি আবেদন করলেন। এরকমই আরেকটি চিঠি লিখেছিলেন ঔরঙ্গাবাদের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন।

সরকার ৯ই জুলাই তারিখের চিঠি দুটি পেয়ে বিদ্রোহের গুরুত্ব বিবেচনা করেন। আবার এক সপ্তাহের মধ্যে ১৬.৭.১৮৫৫ তারিখে বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট সরকারকে জানালেন যে, রাজমহল থেকে দশ হাজার সাঁওতাল সৈন্য সিউড়ি অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে জানালেন পীরপাইতির পরাজয় সংবাদ। সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। বিদ্রোহীরা মির্থিজানপুর, নারায়ণপুর লুণ্ঠন করে। ইতিমধ্যে আরও খবর আসে। ২৭.৭.১৮৫৫ তারিখে বৃন্দাবন ও বাঁশকোলির যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর পরাজয় ও সেনাপতি টৌলমিনের নিহত হওয়ার সংবাদ। এসব জেনে সরকার উদ্বিগ্ন হয়। বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য ভাগলপুরের কমিশনার পুরস্কার[৪৪] ঘোষণা করেন। এই সময় সরকার দেশীয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। এঁরা অবশ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছিলেন। এবার উজাড় করে দিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব ২১টি হাতি, বেশ ক'টি ঘোড়া এবং ১০০ জন সিপাই মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বর্ধমানের মহারাজা, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল পালচৌধুরী সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখরা হাতি পাঠালেন। হান্টার সাহেব এঁদেরকে বলেছেন 'দেশভক্ত'।[৪৫]

পাঁচ

[আমরা এখানে একটি লম্বা চিঠি উদ্ধার করি। এটি লিখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বাংলা সরকারের সচিব। চিঠিটি প্রেরিত হয়েছিল বর্ধমানের কমিশনার ডবু. এইচ. এলিয়ট সাহেবের কাছে। চিঠিটির গুরুত্ব এই কারণে, সাঁওতাল যোদ্ধাদের অগ্রগমন ও আক্রমণ পদ্ধতিতে সরকার কতটা উদ্বিগ্ন; তা বোঝা যাবে। ইতিপূর্বে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় ও পেছু-হটাকে কেন্দ্র করে লেঃ গভর্ণর বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। তাই ব্যবস্থাপত্র কেমন হলো যুদ্ধ-প্রতিরোধের নিদান হিসাবে; তার পরিচয় মিলবে এতে।]

চিঠিটি [৪৬] এরূপ ;—

সাঁওতাল বাহিনীর দমনের জন্য মেজর জেনারেল লয়েডকে অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রথমেই রাজমহল যেতে। বিদ্রোহ দমনে দ্রুত পদক্ষেপ ('Prompt and speedy measures') নিতে বলা হলো। অনতিবিলম্বে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ, দমন ও গ্রেপ্তারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হলো। সরকার লেফটেনান্ট গভর্ণরকে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন সমস্ত স্থানীয় অফিসারদেরও এই মর্মে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা মেজর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, সর্বপ্রকার সংবাদ জানান ও সাহায্য দেন।

সরকার এই নির্দেশ প্রসঙ্গে একটু ব্যাখ্যা দিতে চান যে, সামরিক (মিলিটারি)

বাহিনী স্বাধীনভাবে প্রজাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে তা ঠিক নয়। সাধারণভাবে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেটুকুই করবে শুধু দমন করার ক্ষেত্রে যে কার্যকলাপ প্রয়োজন, কেবল তাই। আবার এটাও বলা হলো, অসামরিক কর্তৃপক্ষের ('civil authority') কাজের ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় রইলো। কেবলমাত্র সৈন্য পরিচালনা, বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দেওয়া হলো একজন অভিজ্ঞ মিলিটারি অফিসারকে। সরকার আরও উল্লেখ করতে চান যে, অসামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ জরুরি অবস্থা না হলে সরাসরি সৈন্য-বাহিনীকে কোনো আদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু তাঁরা মিলিটারি অফিসারদের সহযোগিতা করবেন। বিদ্রোহীদের গতিবিধি, পরিস্থিতি সম্পর্কে মিলিটারি অফিসারদের অবহিত রাখবেন ও পরামর্শ দেবেন। মেজর জেনারেল লয়েড ছাড়াও কর্নেল বার্ডকে ব্রিগেডিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁকে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও বন্দী করবেন। এসব ব্যাপারে দ্রুত পদ-ক্ষেপ নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে মঙ্গলপুরে মিঃ লোচ এবং সিউড়িতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য বলা হয়েছে, আপনাদের কাছ থেকে সবরকম সংবাদ ও সাহায্য পাবেন বিদ্রোহ প্রশমনে। লেফটেনাণ্ট গভর্ণর প্রাগুক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে আশা পোষণ করেন, আপনি ও আপনার অধীনস্থ কর্মচারিরা সম্ভাব্য প্রতিক্ষেত্রে সহায়তা করবেন। আরও অনুরোধ, আপনি দক্ষ ও বিশ্বাসী পথ-প্রদর্শক মিলিটারিকে সংগ্রহ করে দেবেন। এবং যখন যেমন প্রয়োজন গাড়ি ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিছুদিন হলো, পার্শ্ববর্তী জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতি সংগ্রহ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে হাতি ভাগলপুর বা বীরভূমের সদরে পাঠিয়ে দিতে। কয়েকজন সরাসরি কলকাতা থেকে হাতি পাঠিয়েছেন। তাছাড়া, সৈন্যদল যেখানে যখন অবস্থান করবে আপনি অবশ্যই তাদের থাকার ভালো বন্দোবস্ত করে দেবেন। বিশেষ নজর রাখবেন, যাতে সিপাইরা শোয়ার জন্য চারপায়া বা উঁচু পাটাতন পায়। এটাও দেখতে হবে। সম্ভবত ঔষধির ব্যবস্থা না হয়ে থাকলে সেনাদলের অধিনায়ককে প্রয়োজনীয় ঔষধি সংগ্রহ করে দেবেন। বিশেষ করে কুইনিন*। ঔষধের মাত্রা সম্পর্কেও নির্দেশ দেবেন। বিদ্রোহ-সংক্রান্ত পরিস্থিতি ও সেনা-অভিযান অগ্রগতি সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল আপনার কাছ থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পেতে চান। উপদ্রুত জেলাগুলিতে আপনার অধীনস্থ যে সব অফিসাররা নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কাছে এই আদেশগুলি যথাবিহিত পাঠিয়ে দেবেন।

ডব্লু গ্রে.
সচিব, বাংলা সরকার

* পাঠক লক্ষ্য করবেন, সেই সময় ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন ও পাওয়া গেছে।

এই চিঠি ভাষ্যে যে তথ্যগুলি ধরা পড়ে, তা নিম্নরূপ। সাজিয়ে দিই ;—

[সাঁওতাল বাহিনী যুদ্ধে নেমেছে।
তাদের গতি দুর্বার। অপ্রতিরোধ্য।
এই শক্তির দলনে সেনাবাহিনী
সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রে,
ঢেলে সাজানো দরকার। সরকার
সেটাই করলেন। গভর্ণর জেনারেল
উদ্বিগ্ন। তাই তাঁর নামে আদেশ
প্রচারিত হয়। এই আদেশের পশ্চাতে
ইংরেজ সরকারের ভীত বিহ্বলতার প্রকাশ ঘটে।]

১. সাঁওতাল বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ, দমন ও গ্রেপ্তারের সমস্ত দায়িত্ব সহ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে মেজর জেনারেল লয়েড নিযুক্ত হলেন।

২. বর্ধমান কমিশনার ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ম্যাজিস্ট্রেটদের অধিনায়ককে সকলপ্রকার সহযোগিতা দেবার কথা বলা হলো।

৩. সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো। পারস্পরিক সহযোগিতার কথাও নির্দেশিত হলো। মিলিটারি বিভাগের দায়িত্ব একজন অভিজ্ঞ অফিসারের ওপর বর্তালো। অসামরিক বিভাগকে বিদ্রোহীদের গতিবিধি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ ও পরামর্শ দিতে বলা হয়।

৪. বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে কর্ণেল বার্ডকে ব্রিগেডিয়ার পদে নিযুক্ত করা হলো।

৫. কমিশনারকে যেসব ব্যবস্থা নিতে বলা হয় ;

এক. দক্ষ, বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করবেন,

দুই. সেনাবাহিনীর জন্য রসদ সরবরাহ, গাড়ির ব্যবস্থা রাখবেন ;

তিন. হাতি সংগ্রহ করতে হবে ;

চার. সিপাইদের থাকার ব্যবস্থা ও শোবার জন্য চার পায়া বা উঁচু পাটাতনের ব্যবস্থা রাখবেন ;

পাঁচ. ঔষধ সংগ্রহ করে দেবেন, বিশেষ করে কুইনিন।

চতুর্থ পর্ব

···গণযুদ্ধের পরিণতি ·

সাঁওতাল যোদ্ধাদের দুর্বার গতি লক্ষ করে বাঙলা সরকারের নির্দেশে স্পেশাল কমিশনার (এ. সি. বিডওয়েল) একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন ১৭.৮.১৮৫৫ তারিখে। সেই ঐতিহাসিক বিজ্ঞপ্তি বাঙলায়-ও প্রচার করা হয়েছিল। তার বয়ানটি * এই রকম ; —

> "রাজ বিদ্রোহ কর্ম্ম করিয়া অত্র দেশ লুট ও উজার করিতেছে—আর সৈন্যের সহিত আপত্য করিতেছে—উহারদিগের মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তী আছে জে আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম জ্ঞান করিয়া মার্জ্জনা ও পূর্ব্বকারাবস্থা পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে—এ বিষয় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে গভর্ণমেন্ট সর্ব্বদা আপনার প্রজার সুখ···তাহারা মন্দলোকের পরামর্শে কুপথগামী হয় ইচ্ছুক নয় এ নিমিত্ত কেবল এই সকল ব্যক্তী জাহারা প্রধান মন্ত্রী ও সরদার কিম্বা কোন খুন করিতে প্রাধান্যরূপে অধিক থাকা প্রকার হইবেন তদ্বিতিরিক্ত সকল সাঁওতালগণ জাহারা ১০ দশ দিবসের মধ্যে কোন হাকিমের সম্মুখে হাজীর হইয়া আজ্ঞাবাহী হইবেক তাহাদিগের দোশ মার্জ্জনা করা জাইবেক—জখন তাহাদের আজ্ঞাবাহী যুক্ত প্রকাশ হইবে তখন তাবত নালিশ সাঁওতালদিগের যাহা প্রমাণযোগ্য হইবেক তাহা সুন্দররূপে ত্দারক করা যাইবেক কিন্তু যদ্যাপি সকল রাজদ্রোহি এই ইস্তাহার জারির পর বিপরিত আচরণ করে তাহারা সক্ত ও নিদারুণ সাজা পাইবেক। ইতি সন ১৮৫৫ সাল তাঃ ১৭ ই আগষ্ট মোতাক সন ১২৬২ সাল-২ ভাদ্র।"[৪৭]

যুদ্ধ প্রতিরোধের প্রতিষেধক হিসাবে কেবলমাত্র এই বিজ্ঞপ্তিতে খুশি হতে পারছিলেন না ইংরেজ সমরনায়করা। একে তো বর্ষাকাল, তার ওপর ঘনজঙ্গলে সাঁওতাল সৈন্যরা সুবিধে মতো আত্মগোপনের আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করে। ফলে ইংরেজ সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হচ্ছিল ; তাই স্যার এফ্. হ্যালিডে প্রমুখ আগষ্ট মাসের গোড়াতেই 'মার্শাল-ল' জারী করার অনুকূলে ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু স্যার বার্নিস পীকক, স্যার জে. পি. গ্রান্ট অনুমোদন করেননি অন্তত প্রথম ক্ষেপেই। তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দুমাসেরও কিছু বেশি সময়।

---

* তৎকালীন বাংলা গদ্যের নমুনাটি লক্ষণীয়। সরকারি ব্যবহারে এমন অনাড়ম্বর ভাষাভঙ্গির সাহিত্যমূল্য কিছুমাত্র কম নয়।

যাইহোক, এই অংশে আমরা কয়েকটি সরকারি চিঠিপত্র তুলে ধরি, এতে সাঁওতাল যোদ্ধাদের অগ্রগমন, যুদ্ধকৌশল, তাদের অভিযানের এলাকাগুলি যেমন জানা যাবে তেমনি বিপরীত দিকে, ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীর অভিযান, সরকারি আদেশ, ঘোষণা এবং দলন, নিষ্পেষণের পন্থাগুলি সম্পর্কে বোঝা যাবে। মূলকথা, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের তথ্য চিত্র সম্পর্কে কিছু-কিঞ্চিৎ আভাস মিলবে।

এক

॥ চিঠিপত্র ॥

চিঠি □ ১

প্রতি : বীরভূমের কালেক্টর

রানীগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

…আপনার কাছে যদি যথেষ্ট সংখ্যক সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রের কপি থাকে আপনি যত বেশি গ্রামে সম্ভব সেগুলি বিলি করে দেবেন অথবা অন্য উপায়ে ঘোষণা পত্রের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। বেশি সংখ্যক ঘোষণা পত্রের কপি পাওয়ার উপায় নেই। তবে সরকার ঘোষণাপত্রের অনুবাদ ও লিথোগ্রাফ * করার কথা বলেছেন। আশা করছি, দু এক-দিনের মধ্যে সেগুলি হয়ে যাবে। তখন আপনাকে কিছু পাঠাতে পারবো।

যদি কোন সাঁওতাল আপনার কাছে এসে থাকে, আমি অবশ্যই বলবো, আপনি তার নাম তালিকাভুক্ত করে নেবেন এবং নির্দেশমত কাজ করবেন। মুচলেকা এবং সার্টিফিকেট ফর্মও লিথোগ্রাফ করা হবে এবং অনতিবিলম্বেই তা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। …

আপনার রিপোর্টে বলেছেন, যেসব সাঁওতালরা রাজবাধ পলাশীতে জমায়েত হয়েছে ; তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা তুলে নেবেন না। মেজর মেমবার্ডকে এ সম্পর্কে গতকাল নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যেন বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। এবং যদি এরকম হয় এই সাঁওতালরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছে, তবে তাদের আক্রমণ ও ছত্রভঙ্গ করে দিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া যে কোন সশস্ত্র সাঁওতাল জমায়েতের বিরুদ্ধে তাঁকে সৈন্যদের নিযুক্ত করতে বলা হয়েছে। এবং আমি আশা করি, এসবক্ষেত্রে তিনি যে কোন দ্রুত ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবেন না।

জে. আর. ওয়েনস্

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত আধিকারিক।[৪৮]

চিঠি □ ২

* ৪২ নং ইনফ্যানট্রি
লেফটেনান্ট-১
সুবাদার-১
জমাদার-১
হাবিলদার-৬
নায়েক-৬
বিউগিল বাদক-২
সিপাই-৯৪
লস্কর-১
ভিস্তি-১
হিল রেঞ্জার্স
লেফটেনান্ট-১
সুবাদার-১
জমাদার-১
হাবিলদার-৩
নায়েক-৫
ড্রামবাদক-২
সিপাই-৯৭
লস্কর-১
ভিস্তি-১
দেশীয় ডাক্তার-১

ক্যাম্প, দেওঘর, ২১ আগস্ট, ১৮৫৫
প্রতি : ম্যাজিস্ট্রেট, মুঙ্গের

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই আজ সকালে আমার সেনাবাহিনী নিয়ে এখানে এসেছি। সৈন্যসংখ্যা মার্জিনে * দেওয়া গেল।

দিনাপুর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রেরিত ৭ আগস্ট তারিখের ২৯৯ নং নির্দেশের অংশ বিশেষ সবিনয়ের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এতে আমার সৈন্যদলের এখানে আশ্রয়ের জন্য ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু এখানে কতদিন থাকতে হবে সেটা অনিশ্চিত তাই আমি অনুরোধ করছি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিতে। ··তাঁবু ও গোলাবারুদ নিয়ে চলাচলে অসুবিধে হবে। তাই যদি ৩ বা ৪ টি হাতি সংগ্রহ করে দেন তবে কৃতজ্ঞ থাকবো।

এখানে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমার প্রতি নির্দেশ আছে। এই সূত্রে আমি আপনার সাহায্য চাইছি, যদি সম্ভব হয় হাতি পাঠান।

এইচ. ডব্লু. বি. গর্ডন
লেফটেনান্ট
কমান্ডিং ডিটাচমেন্ট।[৪৯]

চিঠি □ ৩

প্রতি : সিউড়ির কালেক্টর

রাণীগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

···এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই দুমকার সাঁওতালরা আমাদের ঠেকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সংকল্পবদ্ধ। আমাদের সকলে মিলে তাদের পালাতে বাধা দিতে হবে। মনে হয় ঘোষণা ** সাঁওতালদের ক্ষেত্রে আমার প্রত্যাশার ভিন্ন দিকটাই ঘটেছে। সরকার এই শীতে জঙ্গল অভিযানের নির্দেশ দেবেন।

রাজবাঁধ পলাশীতে সাঁওতালদের জমায়েত প্রসঙ্গে আমার বিশ্বাস এখন তারা সেখানে নেই। যাই হোক তারা শান্তভাবে থাকুক আর না থাকুক, এ বিষয়ে মেজর মেমবার্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।···

মহম্মদ বাজারে বরকন্দাজের সংখ্যা প্রতুল। যদি স্থানটি অস্বাস্থ্যকর না হয়, ব্রিগেডিয়ার বার্ড যদি আমার চিন্তার সঙ্গে সহমত হন যে সাঁওতালরা হঠাৎ আক্রমণ

* লক্ষণীয়, সেই সময় লিথোগ্রাফও করা যেত।
** ১৭-ই আগস্ট, ১৮৫৫।

করতে পারে তবে এক কোম্পানি সৈন্য সেখানে রাখা যেতে পারে। আমার মনে হয়, ব্রিগেডিয়ার এ বিষয়ে মেজর মেমবার্ড-কে লিখে জানাবেন।

শীতশালের হরমা মাঝি যে আপনার কাছে বা মিঃ লোচের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য এসেছিল, সে সম্পর্কে জানতে পারলে বাধিত হবো। শুনেছি সে সিউড়িতে ফিরে গিয়ে প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে আসবে কিন্তু যাবার সময় বিদ্রোহীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে। তার গ্রাম ধ্বংস করা হয়েছে, সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে। সে কোনোমতে বেঁচে গেছে। কারণ, বিদ্রোহীদের পক্ষে তার এই কাজ খারাপ উদাহরণ।

আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত অনুবাদের লিথোগ্রাফ এখনো আমার হাতে আসেনি।

আই. আর ওয়ার্ড

কমিশনার অন স্পেশাল ডিউটি[৫০]

চিঠি ☐ ৪

রাণীগঞ্জ থেকে মেজর অব ব্রিগেড, বি. প্যারটের সিউড়িতে অবস্থানরত মেজর মেমবার্ডের নিকট পত্র। নং ৮০। ক্যাম্প রানীগঞ্জ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫।

গতকাল সিউড়ি থেকে আর. আই. রিচার্ডসন সাহেবের বার্তা পেয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, মহম্মদ বাজারের চারপাশে সশস্ত্র সাঁওতাল সমবেত হয়েছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। আমাকে ব্রিগেডিয়ার সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এবং এই পরিস্থিতিতে যদি আপনি মনে করেন সার্জেন্ট গিলেনের সৈন্যদল যথেষ্ট নয় তবে আপনার সৈন্যদের নিয়ে আপনি তাঁকে সাহায্য করবেন। অধিকন্তু আরও নির্দেশ হলো এই, যদি এরকম সংবাদ পান যে সাঁওতালেরা সশস্ত্র জমায়েত হয়ে জনসাধারণের ভীতি সঞ্চার করছে, লুটপাট করছে সঙ্গে সঙ্গে আপনি তাদের আক্রমণ করবেন ও ছত্রভঙ্গ করে দেবেন। সৈন্যদের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবার নির্দেশ দেবেন।

বি. প্যারট

মেজর অব ব্রিগেড[৫১]

॥ ডায়েরি ॥

[আর. আই. রিচার্ডসন, বীরভূম জেলার কালেক্টরের ডায়েরি [৫২]]

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

আফজল থানা থেকে সংবাদ এসেছে, বাবুপুর, দেউলি ও বেজুড়ির অধিবাসীরা গ্রামেই আছে। এসব জায়গা সাঁওতালেরা লুণ্ঠন করেনি।

নুনগোলা থেকে ৪ মাইল দূরবর্তী রাজোর সাঁওতালদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে এরা পূর্বেরই দল। আমি কর্ণেল বার্নিকে অনুরোধ করেছি ক্যাপটেন গটকে এই মর্মে নির্দেশ দিতে তিনি যেন একটি বাহিনী নিয়ে নুনগোলায় নৈশ অভিযানে যান এবং সম্ভব হলে বিদ্রোহীদের যাদের সংখ্যা প্রায় ছয়শো হবে, অতর্কিত আক্রমণ করেন।

মহম্মদ বাজারে এখন সবই শান্ত। গুপ্তচরেরা এখনও ফিরে আসেনি। প্রয়োজন হলে তারা ফিরে আসা মাত্র এক মুহূর্তের নোটিশে সেনাবাহিনী সেখানে যাত্রা শুরু করবে।

আমি রামপুরহাট, নাগর এবং দেওঘরের ডাক চলাচল ব্যবস্থা আবার চালু করেছি। এবং এসব অঞ্চল থেকে, তবে দেওঘর ব্যতীত ডাক এখন নিয়মিত চলছে।

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

আফজলপুর, দুবরাজপুর ও নাগব থেকে কোনো খবর আসেনি। গতকাল রাতে আমার অনুরোধে কর্ণেল বার্নি ক্যাপটেন গটকে নুনগোলায় একটি জরুরি বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি ঐ সেনানায়ককে নির্দেশ দিয়েছেন নৈশ অভিযান চালিয়ে আজ খুব ভোরের মধ্যে রাজোরে সাঁওতাল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। এই মাত্র খবর এল, ক্যাপটেন গটের কাছ থেকে যে, তিনঘণ্টা চেষ্টা করেও মোর নদী অতিক্রম করতে তাঁরা পারেননি। গতরাতে খুব বৃষ্টি পড়েছিল। গতকাল রাত্রেই আমি সার্জেণ্ট গিলেনের কাছে মহম্মদ বাজারে একটি পত্রবাহককে পাঠিয়েছি নির্দেশ দিয়ে যে দেওচায় সাঁওতাল বিদ্রোহীদের ওপর তাঁর বাহিনী নিয়ে অবিলম্বে আক্রমণ করতে। দেওচাতে সাঁওতালেরা ফসল লুটপাট করেছিল। এখনও সংবাদ আসেনি তবে মহম্মদ বাজারে সাদা পতাকা উড়ছে, তার অর্থ সংবাদ ভালোই। ওপরবন্ধ, সুরুট অথবা দেওঘর থেকে কোনো সংবাদ আসেনি। রাজবাঁধ, বড়বাতানে সাঁওতালরা বিরাট আকারে দলবদ্ধ হয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫। বেলা দুটো।

কুরিমপুরের শ্রীমণ্ডল ও ফাজিলপুরের কান্ত মণ্ডল আজ রাতে সাঁওতালদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হয়। তারা গরু খুঁজতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আরও এক ব্যক্তি ছিল যে পালাতে পেরেছিল। সে নুনগোলা থানার দারোগাকে এসে এই খবর দেয়।

সার্জেণ্ট গিলেন আবার দেওচা পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বন্যার জন্য এবারেও নদী পার হতে পারেননি। আজ রাতে তিনি আবার চেষ্টা করবেন দ্বারকা নদ অতিক্রম করার।

মোর নদীও স্ফীত হয়ে রয়েছে, ফলে সাঁওতালরা বড়বাতানে অবস্থান করছে। সুরুটের আবগারি দারোগা জানিয়েছে যে তার এলাকার উত্তর দিকের আবগারি বিভাগের সমস্ত লোক পালিয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

নাগর, দুবরাজপুর, আফজলপুর থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসেনি। গাইবাথানে সিউড়ির আঠারো মাইল উত্তরে, তারা নাকি দুর্গ বানাচ্ছে। এটা সন্দেহজনক। তেলুবনীর বিদ্রোহীরা একজন শক্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। যে খুব সম্ভব দামিনীকোর কোনো মাঝি।

ক্যাপটেন গট বৈদ্যনাথপুর পর্যন্ত বিদ্রোহীদের ধাওয়া করে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পৌঁছনোর আগে সাঁওতালরা অদৃশ্য হয়ে যায়।

সুরুট এবং ওপরবন্ধের খবর সন্তোষজনক নয়। সাঁওতালরা দুর্বার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। যাবার পথে লুটপাট করছে।

৫৬ নং রেজিমেন্টের ১০০ জনের একটি বাহিনী আজ সকালে মহম্মদ বাজারে রওনা হয়েছে, তারা সার্জেন্ট গিলেনকে বিশ্রাম দেবে। সার্জেন্ট তাঁর বাহিনী নিয়ে এলে তাঁকে গুঞ্জোর পাঠানো হবে।

সার্জেন্ট গিলেনের সৈন্যদল, সেই সঙ্গে নতুন লোক যাদের মিস্টার ওয়ার্ড সংগ্রহ করেছেন এবং সুরুট অথবা ওপরবন্ধে পাঠাচ্ছেন আশা করা যায় এরাই সাঁওতাল বাহিনীকে ঠেকাতে পারবে, অন্তত যতদিন না এ বিষয়ে আরও কার্যকরী পরিকল্পনা নেওয়া যায়।

আজ সকালে কয়েকজন মাঝি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আমি তাদের নাম যথারীতি নথিভুক্ত করে নিয়েছি।

মোর নদী নিশ্চয়ই পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে, তখনই জানা যাবে উত্তরের সাঁওতালরা সত্যিই কি চায়। ···

২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

নাগরের আট মাইল পশ্চিমে বীরচন্দর একটা বড়গ্রাম, সাঁওতালেরা সেটা লুট করেছে।

দেওঘর থেকে সিউড়ি আমার ডাক সাঁওতালরা বন্ধ করে দিয়েছে। নাগরের পুলিশ জমাদার আমাকে জানিয়েছে চন্দ্রদহ ফাঁড়ি সাঁওতালেরা দখল করে নিয়েছে। যে দুজন ডাকহরকরা ছিল দেওঘর-সিউড়ির পথে, দুজনেই সাঁওতাল। বিদ্রোহীরা তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে।

চামুসাপাড়া, তেলুবনি গ্রামে সাঁওতালরা এগারোটি বিরাট বাড়ি বানিয়েছে। সেখানে তারা লুটের সমস্ত মাল জমা করেছে। সংবাদ মিলেছে, জমাদার তাদের আক্রমণ করলে তারা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আফজলপুরের গোলক

চৌকিদারের পাওয়া একটি শালপল্লব নাগরের পুলিশ জমাদারের মারফত আমি একটু আগেই পেয়েছি। গোলক চৌকিদারের বক্তব্য যে শ্যামপুরার শিবু গোপ মণ্ডল এই শাল পল্লবটির বার্তা তাকে দিয়েছে যে সাঁওতালরা অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সিউড়ি রওনা হবে।

যে লোকটি এই শালপল্লব নিয়ে এসেছিল তাকে শিবু গোপ চেনে না। কিন্তু তাকে নাকি পল্লব বাহক বলে গেছে রায়তরা যেন বিদ্রোহীদের সুবাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে না যায়।

সার্জেণ্ট গিলেন তাঁর লোকজন নিয়ে আজ সকালে মহম্মদ বাজার থেকে ফিরে এসেছেন। নতুন করে সৈন্য নিয়োগ করে তাঁর বাহিনী আবার পূর্ণ করতে হবে। ইতিমধ্যে ট্রেজারি পাহারাদারদের কাছ থেকে তার জন্য গুলি বারুদ আনা হয়েছে এবং সেগুলি ৫৬ নং রেজিমেন্টের অস্ত্র পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রামপুর হাট এবং দুবরাজপুরে সবই শান্ত অবস্থায় রয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

রিপোর্ট এসেছে, ওপরবন্ধ থানা বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে খবর পাওয়া যায়নি।

সাঁওতালরা মনের আনন্দে সুরুট ও ওপরবন্ধ এলাকায় লুটপাট করে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়নি। দেওঘরের যে ডাক গত সন্ধ্যায় রওনা হয়েছিল তা ফিরে এসেছে। ডাকহরকরা জানিয়েছে নাগরের দু মাইল আগে লাওপির পরে তারা এগোতে পারেনি। যাইহোক এটা ম্যাজিস্টেটের জমিদারির ডাক, আমার নিজের বিশেষ ডাক নাগর থেকে সঠিক সময়ে পেঁীছেছে। এবং পুলিস জমাদার নাগরেই ঠিক আছে।

এইমাত্র খবর এল, অসংখ্য বিদ্রোহী সাঁওতাল বৃন্দাবন গ্রামে সমবেত হয়েছে ও বিলকান্দু গ্রামখানি লুট করেছে। নুনগোলা থানায় যে গোমস্তা এই সংবাদ দিল, সে বলেছে, বিদ্রোহীরা শীঘ্রই সিউড়ি আক্রমণ করবে।

আমার এই গোমস্তাটির কথায় খুব আস্থা নেই কারণ এর আগেও অনেকবার ঐ লোকটি মিথ্যা বিপদ সংকেত দিয়েছিল। বিনা কারণে উদ্বিগ্ন করেছে। আসল কথা, সৈন্যাদি প্রেরিত হলে তার মনিবের জমিদারি রক্ষা পাবে।

যাইহোক, ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। সার্জেণ্ট গিলেনের গুর্জোর অভিযান এখনকার মত স্থগিত রাখা হয়েছে।...

আমি আশা করছি, আগামীকালের মধ্যে আরও বিস্তৃত খবর দিতে পারবো।

বাংলা সরকারের সচিবের জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হলো।

স্বাক্ষর : আর. আই. রিচার্ডসন

তিন

॥ প্রতিবেদন ॥

প্রতিবেদন □ ১

বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট বীরভূম থেকে প্রেরিত ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন। তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

গত একপক্ষকাল ধরে নুনগোলা ও ওপরবন্ধ থানার মধ্যে তিরিশটিরও বেশি গ্রাম বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দিয়েছে ও লুট করেছে। নাগরের চার মাইল পশ্চিমে লুরোজোড় থেকে দেওঘরের সীমা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি বিদ্রোহীদের কর্তৃত্বে। ডাক চলাচল বন্ধ হয়েছে, গ্রামের বাসিন্দারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। বিদ্রোহীরা দুটি বিশাল দলে বিভক্ত : একদলের ঘাঁটি রয়েছে ভাগলপুর জেলার মধ্যে ওপরবন্ধ থানার দশমাইল উত্তরে রক্ষাদঙ্গল গ্রামে ; অপর দল রয়েছে সিউড়ির ছ'মাইল পশ্চিমে, ঐ ভাগলপুরেরই নুনগোলা থানা এলাকায়। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, তাদের একেক দলের লোক সংখ্যা প্রায় বারো-চোদ্দ হাজার এবং চতুর্দিক থেকে তারা সাহায্য পাচ্ছে।

রক্ষাদঙ্গলের সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় হাজার তিনেকের একটি দল যাদের নেতৃত্বে আছে মুছিয়া কোসনজালা, রামা মাঝি ও সুন্দরা মাঝি। তারা ওপরবন্ধ থানার নিকটে ঘাটি করেছে, এ মাসের ষোল তারিখের বিকেলে। ঐদিনই তারা থানা ও গ্রাম লুঠ করে। দারোগা ও বরকন্দাজরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওপরবন্ধ থানায় ছিল কিন্তু বিদ্রোহীদের বিশাল সংখ্যা দেখে, বাধাদান নিরর্থক বুঝে তারা পালাতে বাধ্য হয়। দারোগা বহুকষ্টে, শানা ও আফজলপুর হয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে বাইশ তারিখে ; কেবলমাত্র পিঠে সামান্য জামাকাপড় নিয়ে। ক'দিন আগেই দারোগা খবর পেয়েছিল যে থানা আক্রান্ত হতে পারে। সেইজন্য থানার রেকর্ড, ইত্যাদি দেওঘরে পাঠিয়ে দেয় নিরাপত্তার জন্য। সে দেওঘরের মিলিটারি অফিসারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়, কিন্তু দূরত্ব এবং ঘনজঙ্গল হয়ে আসতে হবে বলেই অফিসার সৈন্য পাঠাতে রাজি হননি।

মিঃ ওয়ার্ডকে পরিস্থিতি জানাবার ফলে তিনি আমাকে বলেছেন যে অবিলম্বে সৈন্য পাঠানো হবে রাণীগঞ্জ থেকে শানা থানার মধ্যে জামতাড়া, ওপরবন্ধ এবং আফজলপুরে। বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সৈন্য দল সেখানে অবস্থান করবে। এই মাত্র খবর পেলাম সৈন্যদল শানা থানায় পেঁছে গেছে। শানা থানা রক্ষার পক্ষে এরাই যথেষ্ট। তবে এই এলাকায় এখন পর্যন্ত লুটপাট হয়নি। কিন্তু এখানকার সাঁওতালরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য জড়ো হচ্ছে।

ওপরবন্ধে সৈন্য অবস্থান না হওয়া পর্যন্ত অরাজকতা দূর করা যাবে না। কিন্তু সৈন্য আসার পরই পুলিসদের থানায় পাঠিয়ে দেবো। এবং ডাক চলাচল শুরু

করবো। বর্তমানে এটা সম্ভব হচ্ছে না কারণ রামা মাঝি দু'শত লোক নিয়ে হলদিগড় পাহাড়ের সন্নিকটস্থ জঙ্গলে ঘাঁটি বেঁধেছে। সেই পথে সে যা কিছু পায় লুটপাট করে নেয়।

এই বর্তমান সংকটে, দেওঘরের সিভিল অফিসারের অনুপস্থিতি দুঃখজনক। এখন তাঁর সহায়তা খুবই প্রয়োজন ছিল। পূর্বোক্ত চিঠিতে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একথা লিখেছিলাম।

শিরু মাঝির অধীনে পাঁচ থেকে সাত হাজার সাঁওতাল সংঘবদ্ধ হচ্ছে। তেলাবনীতে মাটি কেটে, পুকুর বানিয়ে তাদের অবস্থান বেশ পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। তারা দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে। তাই নুনগোলা থানার লুণ্ঠিত গ্রামগুলির মধ্য থেকে দু'জন ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে গেছে। গতকাল গুপ্তচরেরা খবর এনেছে তেলাবনীর বিদ্রোহীরা রক্ষাদঙ্গলের দলের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা এসে একত্র হলেই সিউড়ি আক্রমণ করবে। কিন্তু আমি মনে করি এই পরিস্থিতিতে তারা আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। সাঁওতালি ভাষায় যাকে 'দাহরা' বলে অর্থাৎ শালপত্র—এতে যে ক'টি পাতা থাকবে ততদিন পরে তারা আসবে ; তা দেওঘরের এক ডাক-হরকরাকে ধরে সেই শালপত্র কয়েকদিন আগে পাঠিয়েছে। সতর্কতা অবলম্বন করতেই কর্ণেল শহরের উত্তর ও পশ্চিম এলাকার বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করেছেন। আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমার জানা আছে সার্জেন্ট গিলেন ও তাঁর বরকন্দাজেরা যাদের আমি একজন স্পেশাল কমিশনারের কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করেছি তারা প্রয়োজন হলেই নাগরে রওনা হবে। সেখানকার বাসিন্দারা ভয়ে ভয়ে আছে, অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।[৫৩]

এই প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। আমরা তথ্যগুলিকে এভাবে সাজাতে পারি।

১. ১৮৫৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর, এই এক পক্ষ কালের মধ্যে সাঁওতাল যোদ্ধারা তিরিশটি গ্রাম অধিগত করে, দখলে আনে।
২. সৈন্যরা দু'টি দলে বিভক্ত : রক্ষাদঙ্গল গ্রামে একদল এবং অপর দলটি নুনগোলাথানা এলাকায়। দুটি-ই ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত এলাকা।
৩. প্রত্যেক দলে বারো-চোদ্দ হাজার সাঁওতাল সৈনিক ছিল।
৪. চতুর্দিক থেকে তারা সাহায্য পেয়েছে।
৫. রক্ষাদঙ্গল সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় হাজার তিনেকের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মুছিয়া কোসনজালা, রামা মাঝি ও সুন্দরা মাঝি।
   এই প্রতিবেদন থেকে মনে হয় সাঁওতাল সৈন্যরা উপদলেও বিভক্ত ছিল। কারণ রিচার্ডসন সাহেব এতেই বলেছেন, সাঁওতালরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটিতে বার-চোদ্দ হাজার লোক ছিল।
৬. দারোগা, বরকন্দাজরা সাঁওতাল সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়।
৭. সাঁওতাল যোদ্ধাদের অগ্রগমনে ইংরেজ সামরিক বাহিনী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

কর্তৃপক্ষ রাণীগঞ্জ থেকে জামতাড়া, ওপরবন্ধ ও আফজলপুরে সৈন্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন।

৮. আগন্তুক সাঁওতালদের সঙ্গে স্থানীয় এলাকার সাঁওতালরা হাত মিলিয়েছিল।

৯. শিরু মাঝির নেতৃত্বে তেলাবনীতে সাঁওতাল যোদ্ধারা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল। এরা সংখ্যায় ছিল প্রায় পাঁচ-সাত হাজার।

১০. একটি তথ্য, লক্ষণীয়। সাঁওতাল যোদ্ধারা দুর্গাপুজার আয়োজন করছিল। এরজন্য দু'জন ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

১১. সাঁওতাল নেতারা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে শাল-পত্র প্রেরণ করেছে যুদ্ধ সংকেতের প্রতীক হিসাবে।

১২. সেনাবাহিনী তৎপর হয়েছে। সিউড়ি শহরের বিভিন্ন অংশে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। সার্জেণ্ট গিলেন তাঁর বরকন্দাজবাহিনী নিয়ে নাগরে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

চার

॥ চিঠিপত্র ॥

চিঠি ☐ ১.

প্রতি : কর্ণেল বার্নি',

সিউড়িতে অবস্থানরত অধিনায়ক (কমাণ্ডিং)

মেজর মেমবার্ডের পত্র সহ আপনার আজকের তারিখের ১০ নং চিঠির উত্তরে নিবেদন এই, রাণীবিল গ্রামটি মোর নদীর উত্তরে, মহম্মদ বাজার থেকে ১০ বা ১২ মাইল দূরে।

আমার মনে হয় মেজর মেমবার্ড বড়বাথান ও রঙ্গালয়ে সাঁওতালদের অতিক্রম করে রানীবিলে যেতে পারেননি।

আমার কাছে সেরকমই খবর আছে যে সাঁওতালদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রঙ্গালয় থেকে রাণীবিলের পথে তারা রওনা হয়েছে ওপরবন্ধে যাবার জন্য।

আমি রানীবিলে দুজনকে পাঠিয়েছি। তারা আগামীকাল ফিরে আসবে খবরা-খবর নিয়ে।

সিউড়ি, আর. আই. রিচার্ডসন

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ বীরভূমের কালেক্টর

চিঠি ☐ ২.

প্রতি : বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট,
সিউড়ি
তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

সার্জেণ্ট গিলেনের অধীনস্থ সৈন্যদলের প্রত্যেককেই নাগর রক্ষার জন্য প্রয়োজন। আমি বাধিত হবো যদি সিউড়ি ও নুনগোলা থানার দারোগাদের এই মর্মে নির্দেশ দেন যেন তারা মোর নদীর ঘাট ও চরগুলি পুলিস দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করেন।

যদি আপনার অতিরিক্ত পুলিস প্রয়োজন হয় আমি সে বাবদ অর্থ মঞ্জুর করবো। কমিশনার মহাশয় আমাকে সে ক্ষমতা দিয়েছেন।

আর আই. রিচার্ডসন
বীরভূমের কালেক্টর

চিঠি ☐ ৩.

প্রতি : কর্ণেল বার্নি,
সিউড়ির অধিনায়ক

বিভিন্ন দিক থেকে যে সংবাদ আসছে তার ফলে আমার মনে হচ্ছে, এটা ঠিক হবে যে দুবরাজপুর ধরে রাখতে হলে সেখানে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা প্রয়োজন।

জানা গেছে, রানীবিলের কাছে সাঁওতালরা মোর নদী পার হয়ে যাবে এবং আমার মনে হচ্ছে তারা ওপরবন্ধ বা গুজোঁরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য দক্ষিণ দিক থেকে বাঁকুড়ায় চলে যাওয়া। জঙ্গলের পাশেই দুবরাজপুর, সেখানে বহু সম্পত্তি আছে এছাড়া উত্তর পশ্চিম থেকে লোকেরা এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

দুবরাজপুরে সৈন্যরা এলে আশ্রয় ও রসদ পাওয়া যাবে।

আর. আই. রিচার্ডসন
২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ বীরভূমের কালেক্টর

চিঠি ☐ ৪.

প্রতি : কর্ণেল বার্নি,
সিউড়ি

গতকাল মিঃ ওয়ার্ডের একটি চিঠি পেয়েছি, সেটি-ই আমি এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তিনি গুজোঁর নিয়ে চিন্তিত এবং তিনি চাইছেন গুজোঁর যেন সেনারা দখল করে

নেয়। আমার বিবেচনাও তাই, দ্রুত সেরকম পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া, মিঃ ওয়ার্ড বলেছেন গুজোঁর স্বাস্থ্যকর জায়গা।

সার্জেণ্ট গিলেন যিনি নাগরে আছেন, তিনি জানিয়েছেন যে বহুসংখ্যক সাঁওতাল তাঁতিয়াপুরে জড়ো হচ্ছে…। এবং দশহাজার ব্যক্তির রসদ তারা সংগ্রহ করেছে। তাঁতিয়াপুর গুজোঁর থেকে ঠিক সাতমাইল উত্তরে। সুতরাং যদি একটি সৈন্যদল গুজোঁরে রাখা যায়, তাহলে সাঁওতালদের দক্ষিণমুখী অগ্রগমনে বাধা দেওয়া যাবে।

গুজোঁর, নুনগোলা, মহম্মদবাজারে সেনাবাহিনী থাকলে এবং সার্জেণ্ট গিলেন নাগরে সৈন্য নিয়ে অবস্থান করলে, আমার মনে হয় সাঁওতালরা বেশি কিছু করতে পারবে না। উপরন্তু যদি দুবরাজপুর ধরে রাখতে পারি তবে আর কি চাই। আমার বিশ্বাস শীতকাল না আসা পর্যন্ত এটা করা যাবে।

তবে খারাপ দিকটা এই, এই সময় হয়তো গুজোঁর শুধু নামেই টিকে আছে। যাইহোক, এসব বিষয় নিশ্চিত হবার জন্য আমি লোক পাঠাবো। এবং তারা ফিরে এলে আমি প্রয়োজনীয় খবর জানাবো।

আর. আই. রিচার্ডসন
বীরভূমের কালেক্টর

সিউড়ি,
২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

[মিঃ ওয়ার্ডের চিঠিখানার কাজ হয়ে গেলে অনুগ্রহ করে সেটি ফেরত পাঠাবেন। স্বাক্ষর : আর. আই. রিচার্ডসন]

চিঠি □ ৫.

প্রতি : কর্ণেল বার্নি
সিউড়ির সেনাধিনায়ক

ছামোয়াপাড়া ও সন্নিহিত গ্রামগুলিতে সাঁওতালরা অবস্থান করছে কিনা এই সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি মেজর মেমবার্ড ও মিঃ কারের সঙ্গে ছামোয়াপাড়া থেকে দু মাইল ভেতরে গিয়েছিলাম।

আমার গুপ্তচরেরা সঠিক খবরই দিয়েছিল। একখণ্ড জমির পাশ থেকে আমরা আবিষ্কার করলাম অসংখ্য কুঁড়ে ঘর। যে গ্রামবাসী আমাদের সঙ্গী হয়েছিল সে জানালো ছাড়া ছাড়া ভাবে তিনমাইল ধরে তেলাবনী পর্যন্ত সাঁওতালদের আস্তানা গড়ে উঠেছে। এখানেই আছে সুবার বাসস্থান ও প্রধান ঘাঁটি।

…আমরা এগুতেই জানতে পারলাম যে, সাঁওতালদের একটি বাহিনী লুটের মাল প্রত্যহ সংগ্রহ করে রাখছে শীতকালে পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়ে অভিযান চালাবার জন্য।

আমার কাছে মনে হচ্ছে, সিউড়ির সেনাদল দিয়ে এখনই চরম আঘাত করাই

সুবিধাজনক। বিদ্রোহীদের পঙ্গু করার ক্ষেত্রে এবং এর সুফল পেতে হলে আর ভবিষ্যতে তারা যেন আক্রমণ চালাতে না পারে তার জন্য অতিদ্রুত ও গোপনে আঘাত করতে হবে।

বিদ্রোহীদের ঘাঁটির দিকে গভীর জঙ্গল নেই। জায়গাটি উঁচু ও শুকনো। আবহাওয়া সিউড়ির মতোই ভাল।

মহম্মদ বাজারের মিঃ কার স্ব-ইচ্ছায় পথপ্রদর্শক হতে চেয়েছেন। এসব অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি জমি তাঁর চেনাজানা। তাঁর সাহায্য মূল্যবান হবে।

যেকোনো অবস্থায় সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গী হতে পারলে খুশিই হতাম তবে হয়তো আমার কাজে লাগার সম্ভাবনা কম।

[তারিখ নেই] আর. আই. রিচার্ডসন।[৫৪]

রিচার্ডসন সাহেবের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন ও ডায়েরির অংশ বিশেষে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হলো বিদ্রোহী সাঁওতালরা মৃত্যুপণ যুদ্ধে নেমেছিল এবং তাদের রুদ্রমূর্তিতে ইংরেজ সরকার কতটা বিচলিত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল তার আভাস মেলে প্রতিরোধের কৌশল হিসাবে সেনাধিনায়কদের প্রতি সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রভৃতির মধ্যে। সরকারি আদেশে যে শব্দচিত্র তৈরি হয় তা হলো এই ;—

আঘাত,
নির্মূল,
অতিদ্রুত,
অতিগোপন,
অতর্কিত,
আক্রমণ,
এই মুহূর্তে—প্রভৃতি।

রণসজ্জার প্রকরণগত কৌশল হিসাবে এই শব্দগুলি উঠে আসে স্বাভাবিক ভাবে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। যাইহোক, সরকার রণনিপুণ সেনানায়কদের নিযুক্ত করে লড়াই যেমন চালিয়েছিল, তেমনই অন্য পথও ধরেছিল। অতর্কিতে সাঁওতাল পল্লীতে হানা দিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে লাগলো। মানুষের সঙ্গে তাদের গৃহপালিত গবাদি পশুও ধরে নিয়ে গেল। মেজর শাকবার্গ জানিয়েছেন, ২৭শে জুলাই থেকে ২রা আগস্টের মধ্যে (১৮৫৫) ৪০টি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৭ জন সাঁওতাল পুড়ে মরেছে। দুজন গোয়ালা আহত হয়েছে এবং ১০৩৩টা গবাদি পশু আটক করা গেছে। একটি ঠাকুর স্থান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।[৫৫]

তবুও তারা হার মানেনি। নব নব উদ্যমে যুদ্ধের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামে। এক একটি অংশ ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর শাল-

পল্লব পাঠিয়ে নব অভিযানের বার্তা বয়ে নিয়ে গেছেন মাঝিরা একস্থান থেকে অন্যত্র।[৫৬] নতুন করে আক্রমণের কৌশল রচনা করেন, সৈন্য সাজান। মরণপণ লড়াই বলেই 'প্রক্লামেশন' বা ঘোষণা (১৭ই আগস্ট, ১৮৫৫) শুনে তারা বলতে পেরেছিল ; তাদের দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো হোক সেও ভাল ! তবে নতি স্বীকার নয়।[৫৭] রিচার্ডসন সাহেব তাদের অনমনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁর কথা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, অন্তরাল সেনাপতি হিসাবে তাঁর গুরুত্ব বড়ো কম নয়।

এখানে একটি তথ্য লক্ষণীয়। রিচার্ডসন সাহেবের ডায়ারিতে আভাসিত। এতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বাবু বামাচরণ চক্রবর্তী নিজের লোকবল, অর্থ দিয়ে সৈন্যদল গঠন করে মিলিটারিকে সাহায্য করেছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে। এক বাঙালীর এই অযাচিত ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে লেঃ গভর্নর তাঁর সম্পর্কে কুতূহলী হন।[৫৭-ক]

অবশ্য লক্ষিতব্য। ইংরেজরা সাঁওতাল যোদ্ধাদের প্রতি লঘুগুরু আঘাত হেনেও বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। কিন্তু স্বজাতীয় দুই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় একটা তীব্র আঘাতে বিদীর্ণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। ১৯শে আগস্ট সিদু ধরা পড়েন। মহেশপুরে ইংরেজের গুলিতে সিদু আহত হন। চিকিৎসাও চলছিল গোপন আস্তানায়। নিত্যসহচর নাজিয়া মাঝি ও ভুগন মাঝির সহযোগিতায় মেজর শাকবার্ক তাঁকে বন্দী করেন। মুনিয়া মাঝি নামে আর একজন 'ইনফর্মার'-এর কথা জানা যায়। কানু অবশ্য তাকে পরে হত্যা করেন। সরকার মুনিয়া মাঝির স্ত্রীকে চার টাকা পেনসনও মঞ্জুর করেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। ২০শে আগস্ট, ১৮৫৫ তারিখে পুলকিত মেজর দিনাপুর (ভাগলপুর) ডিভিসনের সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনাধ্যক্ষ ক্যাপটেন বীচারকে সিদুর বন্দী হবার খবর জানালেন। আরও জানালেন, কেমন করে সিদুকে ধরা হয়।[৫৮] ২৮শে আগস্ট তাঁকে ভাগলপুরের জেলে পাঠানো হয়।

সিদু ধরা পড়ার পর ইডেনের কাছে যে বিবৃতিটি দেন তা মর্মান্তিক। তাতে তাঁর চেতনা-মূলে দেশপ্রেমাত্মক একটি অরূপ ভাবালুতার পরিচয় মেলে। এবং মর্মদাহ-তো ছিলই। সিদু ধরা পড়ার পরও সাঁওতালদের অভিযান থেমে যায়নি। যদিও পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠলো। সিউড়ির ১৫ মাইল উত্তরের গ্রামগুলি এবং জামতাড়া এলাকার সতেরোটি গ্রাম সাঁওতালরা অধিকার করে নেয়। ডাক চলাচল বন্ধ করে দেয়। যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মিঃ ওয়ার্ড সরকারকে জানান, অবস্থা আয়ত্তের বাইরে।[৫৯]

১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাস। সাঁওতাল যোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করলো। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে না থেকে একত্রে আক্রমণ করার জন্য সাঁওতালদের একটি বিরাট দল সংগ্রামপুরে জড়ো হতে থাকে। এই বাহিনীর দায়িত্বে তখন কানু থাকলেও পরিচালনার ভার চাঁদরায় মাঝির উপরই ছিল। দামিনকো তাদের স্বপ্নের স্থান। রক্তের বিনিময়ে তাকে ধরে রাখার কঠিন শপথ তাদের। ফলে অরণ্য,

পাহাড়ে বেজে ওঠে নাগড়া ও মাদল। যুদ্ধধ্বনিতে সচকিত করে তোলে প্রতিপক্ষকে।

সাঁওতাল নায়করা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের শক্তি অসংগঠিত, খাদ্যও যথেষ্ট নয়। সমরাস্ত্র বলতেও তেমন কিছু নেই। ভরসার কথা ছিল এই। তাদের সৈন্যসংখ্যা তুলনায় ইংরেজদের থেকেও বেশি। তাই তারা সুযোগমতোই অরণ্য, পাহাড়ের আবডাল থেকে সরাসরি আক্রমণ করতে শুরু করলো। কিন্তু ইংরেজ সরকার সংগ্রামপুরে সাঁওতাল বাহিনীর বিরাট সমাবেশ সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞাত ছিল না। ফলে ইংরেজ সেনাবাহিনী কালক্ষেপ না করে কামান বন্দুকসহ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। প্রথমে তারা ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলো। সরল বিশ্বাসে সাঁওতাল সৈন্যরা ভাবলো, দেবতার আশীর্বাদেই বুঝি তাদের গায়ে গুলি লাগছে না। তারা আরও কাছে যেতে থাকলো। পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে থাকলো। ইংরেজরা এই সুযোগই খুঁজছিল। কারণ অরণ্য ও পাহাড় তাদের প্রতিবন্ধক। এসব ক্ষেত্রে সুবিধে করতে পারে না তারা। তাই, ফাঁকা আওয়াজের কৌশল অবলম্বন করে তারা সাঁওতালদের সমতলভূমিতে নামিয়ে আনলো। এর ফলে ইংরেজদের আধুনিক সমরাস্ত্রের আঘাতে শতশত সাঁওতাল সৈন্য প্রাণ দিল। এই যুদ্ধে চাঁদরায় ও কানু পর্যন্ত আহত হলেন।

বলা বাহুল্য, কল্পনার অস্বচ্ছতায় আগাগোড়া সংগ্রামপুরে সাঁওতালদের সৈন্য সাজানো ছিল একটি ব্যর্থ-উদ্যোগ-পর্ব। তবে তাদের সংগ্রামী ঐক্য সম্পর্কে প্রশ্ন চলে না। পরতন্ত্র থেকে মুক্তি পেতে, সকল শ্রেণীর শোষক রাজা, মহারাজা, জমিদার, মহাজন ও নীলকরের হাত থেকে মুক্তি পেতে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। এতে যুক্ত হয়েছিল কামার, গোয়ালা, তেলি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। কখনও এরা গুপ্তচরের কাজ করেছে। কখনও বা এরা উত্তেজনার অংশীদার হয়েছে। কামারেরা তীর, ধনুক, টাঙ্গি তৈরিতে সহযোগিতা করতো এমন কথা উল্লেখ করেছেন ভাগলপুরের কমিশনার।[৬০]

তবুও বলার থাকে। মর্মযন্ত্রণা ছিল বটে তবে সংগ্রামপুরে সাঁওতালদের পরাজয় হলেও তারা হতোদ্যম হয়নি। সিদু ও কানুর সর্বপ্লাবী প্রাণপ্রবাহের মধ্যে সাঁওতাল সৈন্যরা অপরাজেয় উৎসকে খুঁজে পেয়েছে। ফলে আবার নব-উদ্যমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইংরেজরাও বিষমসংকটে পড়লো। কমিশনার সাহেব এই সময় অন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার[৬১] ঘোষণা করলেন। প্রধান নায়কদের জন্য দশহাজার, সহনায়কদের জন্য পাঁচহাজার এবং প্রত্যেক স্থানীয় নায়কদের জন্য এক হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষিত হলো। এতে ইংরেজদের সুবিধে হলো না। সাঁওতালদের দমন করা গেল না। ফলে শাসকদের সদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। অবশেষে সরকার শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ

করলেন 'সামরিক আইন' বা 'মার্শাল ল' জারী করে। ১০ই নভেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে সামরিক আইন ঘোষিত হয়। এতে বলা হলো :—

এতদ্বারা ঘোষণা ও বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে বাঙলার লেফটেনান্ট গভর্নরের ওপর ১৮০৩ সালের ১০ নং অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ বলে ও সপার্ষদ সভাপতির সঙ্গে সহমত হয়ে তিনি এই মর্মে নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে সামরিক আইন জারী করছেন—অর্থাৎ গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী ভাগলপুর জেলায় যে অংশ আছে; ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় যে অংশ আছে ও বীরভূম জেলায়—এবং লেঃ গভর্নর জেলা সমূহের সাধারণ ও ফৌজদারী আদালতের কাজকর্ম'ও স্থগিত রাখছেন। ব্রিটিশ সরকারের এলাকাধীনে যাদের জন্ম হয়েছে বা অধিবাসী এবং সরকারের রক্ষণাধীনের আওতায় পড়ে এমন সকল ব্যক্তি, সাঁওতাল এবং অন্যান্য যারা সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের যে কেউ ঘোষিত তারিখের পর উক্ত জেলাগুলিতে সরকারের প্রকাশ্য বিরোধিতায় সশস্ত্র অবস্থায় ধৃত হবে অথবা সরকারের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করে অথবা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজে লিপ্ত হয়; তা হলে লেঃ গভর্ণর এতদ্বারা এই আদেশ জারী করছেন যে, আনুগত্য স্বীকার করা উচিত এমন সকল ব্যক্তি, সাঁওতাল ও অন্যান্য এই ঘোষণার পর উপরোক্ত কারণে ধৃত হবে তাদের সামরিক আদালতে বিচার করা হবে এবং এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে উপরোক্ত অপরাধে দণ্ডিত হলে ১৮০৪ সালের ১০নং বিধির ৩নং ধারা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।[৬২]

এখন প্রশ্ন। সামরিক আইন বা মার্শাল ল' জারী হওয়ার ফলে সাঁওতাল যোদ্ধারা কি পদক্ষেপ নিয়েছিল? অবশ্যই ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলো। কারণ, আত্মসমর্পণ তাদের মজ্জায় ছিল না। উপরন্তু তারা দুটি পরওয়ানা জারী করলো প্রতিবাদ স্বরূপ। দুটি পরওয়ানা বা 'সন্তালীয় ঘোষণা'র অনুবাদ 'সম্বাদ ভাস্কর'[৬৩] পত্রিকায় ৫.২.১৮৫৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এখানে উদ্ধার করা গেল ;—

"সন্তালীয় ঘোষণা"

সন্তালেরা সুজারাম পুরস্থ মেং জি গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠীতে এবং ভাগলপুরের আদালতে যে দুই পরওয়ানা পত্র পাঠাইয়াছে নিম্নে তাহার অনুবাদ গ্রহণ করা গেল।

১

"শিবশাহ ভগত সুবার আজ্ঞানুসারে সুজারামপুরের কুঠীওয়ালা মেং গ্রাণ্ট সাহেবের উপর।

"সংবাদ লও, এই আজ্ঞা প্রাপ্ত তুমি আপন দ্রব্যাদি লইয়া কুঠী ত্যাগ করিবে, যদি

তুমি প্রতিবাদ কিম্বা কোন ওজর কর তাহা শ্রবণ করা যাইবেক না অতএব এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বুধবারে আমারদিগের সেনারা তোমার কুঠীতে উপস্থিত হইবেক, কোন রাইয়তের হানি হইবেক না, বরঞ্চ তাহারদিগকে রক্ষা করা যাইবেক, তারিখ ১২৬২ সাল ৩০ পোষ। *

দ্বিতীয় পরওয়ানা কমিস্যনর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের চিহ্নিত ভৃত্যদের উপর।

২

"শিবশাহ ভগত সুবা সম্ভাবিত রাজার আজ্ঞা"

"রামজিও লাল দেশ জয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি লিখিতেছি, তুমি আমাকে জানাইবে যে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা যুদ্ধ করণে মনস্থ করিয়াছে কিনা? যদি আমারদিগের সুবারা আক্রমণ করে তবে রাইয়তদিগের ক্ষতি হইবেক এবং যদি ইংরাজ সেনারা আইসে তথাচ রাইয়তেরা ক্লেশ পাইবে, অতএব ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে কেবল কিশোরীয়া সুবার সহিত ইংরাজেরা যুদ্ধ করুন, তাহা হইলে রায়তদিগের কোন হানি হইবেক না, এই পরওয়ানার কর্ম্ম ডাকযোগে ঐ সকল লোকদিগকে জ্ঞাত কর যাহারদিগের নিমিত্ত ইহা লেখা হইল।

সেরেস্তাদারকে লেখা যায়।

তারিখ ১২৬২ সাল ২৯ পৌষ পূর্ণিমা, সোমবার

সরকার মার্শাল ল' জারী করে সবকিছুই সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। ফলে সেনাবাহিনী সীমাহীন অত্যাচার চালাতে থাকে। সাঁওতাল গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, ভস্মীভূত করে। তাদের গবাদি পশু ও খাদ্য দ্রব্য আটক করে। আত্মগোপনের আস্তানা ও খাদ্য শস্যের অভাবের ফলে সাঁওতাল যোদ্ধারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এই সময় তারা দলে দলে ধরা পড়ে। জেলগুলি ভরে ওঠে। ইংরেজ সরকার তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করতে থাকে। খাদ্য বস্ত্র ও পানীয়ের অভাবে তারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এই সময় ব্যাপকভাবে তারা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে সিবিল সার্জন এ. আই. শেরিধান সাহেব সরকারকে জানালেন। তাঁর প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করলেন একটি উদাহরণ তুলে। উদাহরণটি এমন: ৮০ জন সাঁওতালকে দিবারাত্র থাকতে হচ্ছে ৫০ ফুট লম্বা, ১৮ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘরে। সেখানে একটি মাত্র পায়খানা সবলের জন্য। সেখানে সকলেই উলঙ্গ প্রায় এবং সকলকেই মাটির মেঝেতে শুতে হতো। এই মুহূর্তে তাদের জন্য এক পয়সা বা দু' পয়সা প্রত্যেহ খরচ করা হচ্ছে।[৬৪]

* 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার প্রথম পরওয়ানা ৩০শে পৌষ ১২৬২ সাল এবং দ্বিতীয় পরওয়ানা হিসাবে ২৯শে পৌষ, ১২৬২ সাল উল্লেখিত হয়েছে। সেভাবেই প্রদত্ত হলো।

পরের প্রতিবেদনটিও ছিল সাপ্তাহিক। ১৭ই নভেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে তিনি আরও স্পষ্ট করে লিখলেন যে, সাঁওতালদের যেভাবে জেলে রাখা হয়েছে তা অস্বাচ্ছন্দ্যকর এবং অস্বাস্থ্যকরও বটে। তাঁর তীক্ষ্ম মর্মঘাতী পত্রটি এরূপ ;[৬৫]—

১. বীরভূমে অতিরিক্ত গরম থাকে সাধারণতঃ জুলাই থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এহেন অবস্থায় জেলগুলি ভয়ানকভাবে ভর্ত্তি।

২. প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং তা অস্বাস্থ্যকর।

৩. বন্দীদের পোষাক অপর্যাপ্ত।

৪. উত্তেজক মাদক দ্রব্যাদি মদ ও তামাক গ্রহণ করতেই তারা অভ্যস্ত। এখানে সেসব মেলে না।

শেরিধান সাহেবের রিপোর্ট পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট আর. থমসন সাহেব বীরভূমের জেলের অবস্থা শোচনীয় বলেই স্বীকার করলেন। তিনি এই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে ২২শে নভেম্বর এক পত্রে, অপ্রসন্নচিত্তে জানালেন বীরভূম জেলে ১১৩ জন বন্দীর অবস্থা প্রকৃতই আশংকাজনক।

সাঁওতাল সৈন্যদের মনোবল যখন ভেঙে যাচ্ছিল, বিভ্রান্ত, তখন নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তাদের সংঘাত পরিপূর্ণ জীবন-প্রচ্ছদের ওপর শেষ আঘাত নেমে এল। কানু ও তাঁর অপর দুই ভাই ধরা পড়লেন। তাঁরা হাজারিবাগ অভিমুখে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশের 'ইনফর্মার' জায়োয়ার সিং[৬৬] নামে এক ব্যক্তি তাঁদের ধরিয়ে দেয়। তাঁদের জীবনের তরঙ্গ বিক্ষোভ বারংবার আঘাতে আঘাতে দীর্ণ হলো। যুদ্ধ এখানেই থেমে গেল। শোষণমুক্তির লড়াইয়ে নেমে বিদেশী বিতাড়নের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তাঁদের দেশ-চেতনা অবশ্য লক্ষণীয়। সেই মুহূর্তে তাঁদের গতি স্তব্ধ হলো বটে তবে হৃদয়ের উত্তাপ-উত্তেজনা রইলো সমানভাবে।

শ্বেতপ্রশাসনের জয় সূচিত হয়েছে। আশংকাও অনুপস্থিত। কিন্তু অরণ্য পুরুষদের নিভূর্ষণ-সারল্যের মধ্যে যে কঠিন, সত্য-যোদ্ধার স্বরূপ দীপ্যমান ;— গণমনের যে ঐক্যবন্ধন ; যা একান্তই প্রশাসনকে বাস্তব সমস্যা ও যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছে তা তারা ভুলে যাবে কেমন করে। তাই বিচারের নামে প্রহসন শেষ করতে চাইলো দ্রুতান্বিত।

কানু ও অন্যান্য প্রধান নায়কদের বন্দী ও বিচার প্রসঙ্গে সরকারি দুটি চিঠি[৬৭] উল্লেখ করা যেতে পারে।

১

বীরভূমের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্পেশাল কমিশনারের কাছে
বাংলা সরকারের সচিব ডব্লু. গ্রে সাহেবের পত্র।

১৮২২ সালের রেগুলেশন অনুসারে সরকারি নির্দেশ।
লেঃ গভর্নরের আদেশ আপনাকে জানাচ্ছি। তিনি চাইছেন, বীরভূমের স্পেশাল কোর্টে বন্দীদের বিচারের জন্য আনা হোক।

নিম্নে উল্লেখ করা হলো ১৯ জন বিচারাধীন বন্দীর প্রসঙ্গে। এরা ভাগলপুর জেলায় বিদ্রোহ ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত ছিল।

—চিঠিটি ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে লেখা হয়।

চিঠিটির গুরুত্ব এই কারণে, এতে ১৯ জন বন্দীর নাম উল্লেখ ছিল। লক্ষণীয়, কানু, ভৈরব ও চাঁদ মাঝির নাম একটি বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছিল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ অর্থেই।

২.

এ. ইডেন
এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্পেশাল কমিশনার
সিউড়ি।
প্রতি,
ডব্লু. গ্রে
সচিব, বঙ্গীয় সরকার
তারিখ ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৫৫, সিউড়ি।
মহাশয়,

নিবেদন এই,—আমি সিউড়িতে ৬৯ জন বন্দী নিয়ে পৌঁছেছি। এরা অধিকাংশই বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা বা হত্যাকারী। আমি সরকারের অনুমোদন পাবো, এই প্রত্যাশায় ১৮২২ সালের রেগুলেশনের অষ্টম ধারা অনুসারে নিম্নোক্ত সকলের বিচার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছি। তাদের বিচার দ্রুত হওয়া উচিত। সেটাই কাম্য। ভবদীয়—

এ. ইডেন
এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্পেশাল
কমিশনার।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে। এই চিঠিতে ইডেন প্রথমে ২৬ জনের তালিকা দেন যারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিল। পরের দিন বাকি ৪৩ জনের তালিকা দেবেন বলেছিলেন। এখানে বলে রাখা ভাল। একই দিনে ২৪. ১২. ১৮৫৫ তারিখে ইডেন সাহেব ও গ্রে সাহেব দুই প্রান্ত থেকে বন্দীদের বিচার প্রসঙ্গে পত্র লিখেছিলেন।

যাইহোক, ইডেন সাহেব তাঁর তালিকার মধ্যে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে বন্দীদের নাম লিখেছিলেন। যথা ;—

৫ নম্বর কানু সুবা,
৬ নম্বর ভৈরব সুবা,
৭ নম্বর চাঁদ সুবা।

এই পত্রে, ক্রমিক সংখ্যা ৫, ৬, ৭-এর পাশে একটি বন্ধনী যুক্ত করে লিখেছিলেন এরা বিদ্রোহ, হত্যা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধে যুক্ত ছিল। কানুর ধরা পড়ার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। এই খবরে লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্বস্তি বোধ করলেন। সাঁওতাল যোদ্ধাদের প্রধান ব্যক্তিরা ধরা পড়ার ফলে যুদ্ধ একরকম শেষ হলো। শুধু শেষ হলো না সামরিক বাহিনীর তাণ্ডব। সাঁওতাল পুরুষ মাত্রই গ্রেপ্তার হতে থাকলো। ক্যাপটেন ফিলিপস ৪ঠা ডিসেম্বর কাজুরিয়ার পনেরো মাইল দূরের জঙ্গল থেকে নিরস্ত্র ২৫০ জন সাঁওতালকে বন্দী করেন। এমনকি, হাজার চারেক গবাদি পশুও আটক করলেন। যাইহোক, পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যেই এল। জেনারেল লয়েড ১৩. ১২. ১৮৫৫ তারিখে সামরিক বাহিনীকে তুলে নেবার প্রস্তাব দিলেন। সরকার অবশ্য সেই মুহূর্তে সৈন্যবাহিনীর সব অংশ প্রত্যাহার করেননি।[৬৮] ছাই চাপা আগুনেও তাদের ভয়।

ভাগলপুরের সেসনজজ সিদুর বিচার শেষ করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য কেসটি সদর আদালতে পাঠান। 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং বেঙ্গল 'হরকরা'-তে সিদু সম্পর্কে সংবাদ বের হয়। অনেকেরই দুর্ধর্ষ ব্যক্তিটির আইন মাফিক[৬৯] বিচার ভাল লাগেনি। অবশ্য 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' আইনের বিচার চেয়েছিলেন। সদর আদালত সিদুকে ফাঁসির আদেশ দেন। কেবল সিদু নয়, পুর্তো মাঝিসহ আরও তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়। লেঃ গভর্নর হ্যালিডে সাহেব তাঁদের ফাঁসির আদেশ অনুমোদন করেন। বঙ্গীয় সরকারের সচিব ডব্লু. গ্রে সাহেব ৫ই ডিসেম্বর ভাগলপুরের কমিশনার বিডওয়েল সাহেবকে এই আদেশের কথা জানান। তিনি আরও জানালেন যে সিদু মহেশ দারোগাকে যেখানে হত্যা করেছিল সেই বীরু অথবা বাবুপুরে, সিদুসহ অপর তিনজনকে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর পুর্তো মাঝিকে কলগাঁ-এর নিকট চন্দ্রপুরে যেখানে সে একটি হিন্দু পরিবারকে হত্যা করেছিল সেখানে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রে সাহেব লেঃ গভর্নরের 'ইচ্ছা'-র কথা জানিয়ে বললেন যে, ফাঁসির খবর এমন ব্যাপকভাবে প্রচার ('wide publicity') হওয়া দরকার, বিশেষ করে সাঁওতালদের কাছে একটি উদাহরণযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। (to be an example to others, and specially to the Sonthals themselves')[৭০]

সঠিক তারিখ না পাওয়া গেলেও সিদুকে ডিসেম্বরের মধ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। সচিবের চিঠিতে মেলে যে, দামিন-ই-কোহ ছাড়া পাশ্ববর্তী জেলাগুলিতে এই বিষয় সম্পর্কে নোটিশ দেবার কথা বলা হয়েছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিকে ফাঁসি স্থলে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

কানু ও তাঁর অপর দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ঐ অপরাধে স্পেশাল কমিশনার এলিয়টের বিচারে কানুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং চাঁদ ও ভৈরবের[৭১] যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। লেঃ গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের

আদেশক্রমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ভগনাডিহির যে বাড়িতে তারা বিদ্রোহের মন্ত্রণা করেছিলেন এবং যে অঙ্গন ঠাকুর বাড়ি নামে পরিচিত ছিল ; সেখানেই কানুকে ২৩. ২. ১৮৫৬ তারিখে দুপুর দুটোতে ফাঁসি দেওয়া হলো।

সাঁওতাল যোদ্ধারা অসমযুদ্ধে নেমে প্রবল প্রতিপক্ষকে এই শিক্ষা দিয়েছিল যে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, জনজাগরণ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলাতে পারে। তাই, মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, শোষণ যন্ত্রণা মুক্তির অন্তিম লক্ষ্যে, স্বাধীনতার স্বপ্ন সাধনায় তাদের মুক্তিযুদ্ধ নিষ্ফল হলো না।

॥ তথ্য-সূত্র ॥

১. G. A. Grierson, Linguistic Survey of India, first-reprint,

২. Ibid, p. 30

৩. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,

৪. দুরবীন সরেন, সাঁওতাল সংস্কৃতি, পৃ. ৫—প্রসঙ্গ—লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার, পুরুলিয়ার ডাইনী বিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৬

৪-ক Linguistic Survey of India, p. 30

৪-খ E. T. Dalton Decriptive Ethnology of Bengal, p. 452, প্রসঙ্গ—সরকার, তদেব, পৃ. ১১

৫. L. S. S. O'Malley : Bengal District Gazetteers ; Santal Parganas : প্রসঙ্গ—সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে অপারেশন বর্গা, রাজস্ব পর্ষদ. ১৯৮০, পৃ. ১৯

. Kalikinkar Dutta, The Santal Insurrection of 1855-57, 1940, pp. 2-3। এবং দ্র, মুহম্মদ আবদুল্লারসুল, সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী, পৃ. ১৮-১৯। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ১৭

৭. P. C. Roychoudhury, Bihar District Gazetteers : Santal Parganas p. 74

৮. Dutta, Ibid. p 3

৯. চৈতন্য হেম্ব্রমকুমার, সাম্তাল পারগানা, সাম্তাল আর পাহাড়িয়া কোয়াঃক্ ইতিহাস, পৃ. ৫৭-৫৮, প্রসঙ্গ—সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস পৃ. ১৮

১০. গোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, সাঁওতাল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৩৮১, পৃ. ৩৯-৪০

১১. Dutta Ibid, p. 5

১২. Judicial Proceedings No 157, dt. 14. 2. 1856.

১৩. মিঃ পনটেট এক রিপোর্টে লিখেছেন : "…I am sure the whole debt had been paid ten-fold. These poor fellows from not being able to read and write, have no check whatever over the Bengally in marking off their payments and as for the Bengally giving a receipt when paid in full, or returning the lands, such a thing is never known…". দ্র, Judicial Proceedings No. 157. dt. 14. 2. 1856.

১৪. Calcutta Review, 1856, p 241

১৫. জেলের ভয় দেখানো প্রসঙ্গে হান্টার সাহেব লিখেছেন ; মহাজনেরা "brought the ignorant creature (অধমর্ণ সাঁওতাল) to his knees by artfully exaggerating the terrors of the jail." দ্র, W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal 1872 p. 233

১৬. Judicial Proceedings No. 157, dt. 14.2. 1856

১৭. A. C. Bidwell (ভাগলপুরের অস্থায়ী কমিশনার) তাঁর রিপোর্টে বলেছেন : "In Seedoo's examination before Mr. Eden he states that he (সিধু) and others had repeatedly complained of the oppression of the Mahajuns to Mr. Pontet, but could get no redress. That these Mahajuns take 5 rupees interest for 1 rupee lent and purchase their rice at unfair rates, and if they don't give it, pull their ears and beat them that his rent has been raised and the Naib Sezuwals who make the collection take 10 or 5 rupees for each village for 'Salamee'…" দ্র, Judicial Proceedings Ibid.

১৮. Dutta, Ibid pp. 5-6

১৯. Calcutta Review, March 1856, pp. 240-41

২০. সংবাদ প্রভাকর, ৫৩০০ সংখ্যা, ১৬. ৪. ১২৬২। এবং দ্র, Hunter, Ibid p, 230

২১. Judicial Proceedings, Ibid

২২. Edward Garnet Man, (E. G. Man), Sonthalia and the Sonthals, London, 1867, pp 119-20

২৩. রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব (বাসাসংস্থাবিপ্র),

২৪. E. G Man, Ibid, p, 120

২৫. Dr. R. C. Mazumdar, British Paramountcy and Indian Renaissance, Part I, p, 457.

২৬. দ্র, সাঁওতাল বিদ্রোহের অমরকাহিনী, পৃ. ৯

২৬.ক. Gocho দ্র, The Santal Insurrection p, 12 জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী এন. সি. মাণ্ডি বলেন, 'Gocho' নামে কোনো ব্যক্তির ডাক-নাম হতে পারে না। এটি কু-অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি খুব সম্ভব 'গোকক' হবে।

২৭. "We shall see how much twine could the Daroga procure, so as to fasten the peaceful Santals whom the wicked Daroga to be sent up." দ্র, Dutta, Ibid, pp 12-13

২৮ Calcutta Review, March, 1856, p. 243

তুলনীয় = তু,

"শতাব্দীকালের সঞ্চিত বিক্ষোভ আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মত ফাটিয়া পড়িবার পূর্বক্ষণে সমস্ত সাঁওতাল অঞ্চলের অভ্যন্তরে আলোড়ন আরম্ভ হইয়া যায়।"

দ্র, সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ,

২৯. Judicial Proceedings No 221, dt. 23rd August, 1855

৩০. F. B Bradly Birt, The Story of an Indian upland, p. 186 প্রসঙ্গ—সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস দ্র, বঙ্গানুবাদ, পৃ, ৫৫

৩১. Calcutta Review, 1856, pp 243-44

৩২. Ibid, p 244—এই পত্রিকা লিখল: "Possibly their own imagination may have represented them to themselves as real, no doubt they succeeded to a certain extent in inducing a belief of their truth."

তু. "আমি কানুর বাটীতে প্রবেশপূর্বক সাঁওতালদিগের ঠাকুর পাইয়াছি, ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত চাকার ন্যায়, তাহার দুইস্থানে ছিদ্র আছে তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া ওঠে। দুগ্ধ ঊর্দ্ধে গমন করে ঐ ঠাকুরের আরও অনেক আশ্চর্য কথা নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগের মুখে শ্রবণ করিলাম।" মিঃ টুগুড সাহেবের পত্র, দ্র, সংবাদ প্রভাকর, ৯. ৮. ১৮৫৫

৩৩. '...when the Sal branches, their signal for war...was passed by willing hands from village to village the whole of the peaceful, industrious race rose as one man to contend not only for their rights,—for they had long since given up all hope of getting those,—but bare existence, as they had no faith in a government which seen only

through the police, and in their quarrels tyrannical unjust and extortionate." দ্র, E. G. Man, Ibid, pp. 16-17

৩৪. এই চরমপত্র দেওয়ার কারণ, বিদ্রোহীরা চেয়েছিল, "possession of the country and set up a Government of their own." দ্র. Calcutta Review, 1856, p, 243

৩৫. শ্রীউমা শঙ্কর, বিহার সমাচার, স্বাধীনতা অংক, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,

৩৬. মিঃ পনটেট বিডওয়েল সাহবকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে, মিঃ ব্রাউন নামে এক অফিসার তাঁকে (পনটেটকে) জানিয়েছেন, সিদু দারোগা মাহেশ দত্তকে হত্যা করল তার কারণ এটা নয় যে, সিদু "could not have had any personal cause of complaint against him because his (Seedoo's) house was not within his jurisdiction. But Mohesh Dutt might be, and probably was abnoxious to the whole tribe of Sonthals, on account of his extortion and Seedoo it might be said acted not his individual capacity but as the constituted leader of the insurgent Sonthals in revenging their wrongs." দ্র, Judicial Proceedings No. 157, dt. 14. 2. 1856

৩৭. Dutta, Ibid, p, 16

৩৮. Judicial Proceedings No. 47, dt. 10. 7. 1856

৩৯. V. Raghaviah, Tribal Revolts,

৪০. Judicial Progs. No. 157, dt. 14. 2. 1856

৪১. চৈতন্য হেম্ব্রমকুমার, সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়া কোয়াঃক ইতিহাস, পৃ. ৬৯। প্রসঙ্গ—বাস্কে, তদেব, ১৯৮২ সং, পৃ. ৬৪

৪২. Dutta, Ibid, p. 26

৪৩. The Friend of India, July, 26, 1855

৪৪. সমাচার সুধাবর্ষণ-এ (১২ই শ্রাবণ, ১২৬২) তথ্যটি এরকম : "গভর্ণমেণ্ট এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সাঁওতালদিগের রাজার মস্তক কাটিয়া দিবেক তাহাকে পাঁচ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন, আর যিনি তাহার অনুচরের শিরচ্ছেদন করিয়া আনিবেক তাহাকে ও প্রত্যেক মস্তকের হিসাব ১০০০ টাকা প্রদান করণে সম্মত হইয়াছেন।"

৪৫. Hunter, Ibid, p. 246

৪৬. Letter from the Secretary to the Government of Bengal to W. H. Elliot, Commissioner of Burdwan, dated Fort

William, The 30th July, 1855, No. 1786. অনুবাদ মূলানুগ নয়। দ্র, A. Mitra, West Bengal District Records, New Series, Birbhum 1786-1797 & 1855, pp. 132-33। এবং আরও দ্র, Santal Rebellion—Documents : Compiled by Tarapada Roy,

৪৭. Copy preserved in the office of the Deputy Commissioner of Santal Parganas, Dumka—প্রসঙ্গ, K. K. Dutta, Ibid, p, 86 তু. সংবাদ প্রভাকর (২-রা আশ্বিন, ১২৬২) এতে বলা হয়েছে: "সাঁওতাল বিদিতার্থ কমিস্যনর বিড়োএল সাহেব এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন যে ১০ দিনের মধ্যে যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন দোষ স্বীকার করিবেক গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কেবল কুচক্র কারিগণের প্রতিই বিহিত দণ্ডবিধান হইবেক।"

৪৮. Tarapada Roy, Ibid, pp. 33-34। চিঠিপত্রগুলির জন্য দ্রষ্টব্য গ্রন্থটি।

৪৯. Ibid, pp. 34-35

৫০. Ibid, pp. 35-36

৫১. Ibid, pp. 36-37

৫২. Ibid, pp. 11-15

৫৩. Ibid, pp. 41-43

৫৪. Ibid, pp. 25-28

৫৫. দ্র, Judicial Proceedings No. 159, dt. 30. 8. 1855

৫৬. Judicial Proceedings No. 82, dt. 4. 10. 1855

৫৭. Judicial Proceedings No. 28, dt. 25. 10. 1855
রিচার্ডসন সাহেব লিখেছেন "The proclamation seems to have been received in all quarters with supreme contempt, many of the copies were torn up, and thrown in the faces of those who brought them to the Sonthals".

৫৭-ক বঙ্গীয় সরকারের সচিব এ. ডব্লু. রাসেল সাহেব লিখেছিলেন রিচার্ডসন সাহেবকে। পত্র নং ২৬৬৭ তারিখ ২. ১০. ১৮৫৫।

৫৮. মেজর শাকবার্গ (Shuck Burgh) উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন, "I can not close this letter without expressing the great pleasure it has given me to report of the capture of the chief rebel." (সিধু)। দ্র, Judicial Proceedings No. 27, dt. 4. 10. 1855

৫৯. মিঃ ওয়ার্ড লিখেছেন, "The population has fled, panic struck and here we are positive powerless."—Judicial Proceedings No. 76 dt. 4. 10. 1855

৬০. Letter from the Commissioner of Bhagalpur to the Secretary to the Government of Bengal, dt 28. 7. 1855

৬১. K. K. Dutta, Ibid, p, 29

৬২. C. E. Buckland, Bengal under the Lieutenants Governors, Vol. I, p. 1

লক্ষণীয় □ হিন্দু প্যাট্রিয়ট এই সামরিক আইনের খারাপ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছে যে, বিদ্রোহী সাঁওতালদের সম্পর্কে সরকারের প্রকৃতই অস্বচ্ছ ধারণা। এসব দিয়ে তাদের দমন করা যাবে না। অবশ্য সামরিকবাহিনী আইনগতভাবে তাদের হত্যা করলেই কেবল সক্ষম হবে। দ্র, Hindoo Patriot, 15. 11. 1855

৬৩. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৫-৯৭

৬৪. Judicial Proceedings, No. 273, dt. 27. 12. 1855

৬৫. Ibid

৬৬. এ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশাল কমিশনার ইডেন সাহেবের সুপারিশক্রমে জারোয়ার সিং এই কাজের জন্য ৯০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। Judicial Proceedings No. 131, dt. 20. 12. 1855

৬৭. প্রথম চিঠিটির উল্লেখ দ্র, Judicial Proceedings No. 47, dt. 10. 1. 1856 এবং দ্বিতীয় চিঠিটির জন্য দ্র, Judicial Proceedings No. 48, dt. 10. 1 1856

৬৮. জেনারেল লয়েড সামরিক বাহিনী তুলে নেবার কথা বলেছিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে গভর্নর হ্যালিডে সাহেব সামরিক বাহিনীর কিছু অংশ শান্তি স্থাপনের কাজে লাগিয়ে বাকি অংশ ফিরে যাবার আদেশ দেন। এই আদেশে জেনারেল লয়েডের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয় এবং হ্যালিডে সাহেবের খুশির মাত্রাও ধরা পড়ে। "The Santal Insurrection having been happily suppressed and the time having arrived when the force employed under the command of Major General Lloyd C. B. may safely be taken up, it remains only that amount of military force requisite for the present preservation of the peace be determined upon

in order that the rest of the troops may be permitted to return to the quarters…". দ্র, Judicial Proceedings No. 50, dt. 10.1.1856

৬৯. হরকরা-র প্রতিনিধি লিখেছিলেন ; "Seedoo Manghy the Sounthal Chief, is to pay the extreme penalty of the law." হিন্দু প্যাট্রিয়ট মন্তব্য করল, "He must be tried first and convicted." দ্র, Hindoo Patriot, dt. 8th Nov, 1855

৭০. দ্র Judicial Proceedings No. 113, dt 6. 12. 1855

৭১. চাঁদ ও ভৈরবের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা অপর দুই ভ্রাতার ন্যায় অতটা দোষী নয়। যদিও দারোগা হত্যার সময় তাদেরও সায় ছিল। তবুও "they have been equally recognised as ring leaders thro ghout the two younger brothers may perhaps have been less blood thirsty and less active because they are young and less experienced." দ্র, Judicial Proceedings No. 131, dt. 20. 12. 1855

…সাঁওতাল গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া…

বাঙলা সাহিত্যে সাঁওতাল গণযুদ্ধের প্রভাব-প্রসার দুর্লক্ষ্য নয়। এর কারণ সংগ্রামী মানুষদের বলিষ্ঠ চেতনা দেশ হিতৈষণা নতুন পথ প্রবাহে রূপবদ্ধ হয়েছে। জনজাগরণের দিব্যদাহ ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে সত্য কিন্তু একটি জাতির পক্ষে সম্মিলিত প্রয়াস তাতে ছিল না বললেই হয়। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ সাঁওতাল জাগরণে ছিল তা বলাই বাহুল্য।

এতে কয়েকটি জিনিস রূপভেদে একেবারেই নতুন। যেমন, ১. গণসভা; ২. গণসিদ্ধান্ত; ৩. গণপদযাত্রা; ৪. গণপ্রতিবাদ; ৫. গণযুদ্ধ। এমনকি, মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তাদের শুরু হয়েছিল গণমৃত্যু। এই গণমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে হান্টার সাহেবের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। এটি এক সামরিক অধিনায়কের মন্তব্য: "It was not war", the commanding officer went on to say: "they did not understand yielding. As long as their national drums beat, the whole party would stand, and allow themselves to be shot down. Their arrows often killed our men, and so we had to fire on them as long as they stood. When their drums ceased, they would move off for about a quarter of a mile; then their drums began again, and they calmly stood still we came up and poured a few volleys into them. There was not a Sepoy in the war who did not feel ashamed of himself."[১]

বলার থাকে। তাদের স্বাদেশিকতা, জাতীয় চেতনা রণদামামার সমসুরেই বাঁধা। তাই, মৃত্যু প্রশ্ন সেখানে গৌণ। এহেন 'স্পিরিট'কে শ্বেত প্রশাসন পীড়ন দলন করেছে নিজেদের স্বার্থেই। সুতরাং গণযুদ্ধের প্রসঙ্গে বিচার-প্রচার, রূপায়ণ-চিত্রায়ণ এদের হাতে অন্যরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অবাক হবার কিছু থাকে না যখন 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রশাসনকে পরামর্শ দেয় "…restore the prestige of the British authority, the mass of Santals should not remain unpunished".[২]

'ক্যালকাটা রিভিউ' দুঃখ প্রকাশ করলো এই বলে যে, বিদ্রোহীদের নিধনযজ্ঞ সমাধান করতে সামরিক শক্তির প্রয়োগে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হয়নি।[৩] এসব কথা স্বাজাত্যাভিমান থেকেই এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে। সেদিনের শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকেই এই গণযুদ্ধকে তির্যক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। কিন্তু পরবর্তী

সময়ে অনেকেই একে সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে দেখেছেন। এর মধ্যে খুঁজেছেন বিদ্রোহের মহাপ্লাবন। স্বাধীনসত্তার চৈতন্য। এই দেখা কালের সীমায়িতিতে বন্দী নয়। তাই স্বাধীনোত্তর বাংলা সাহিত্যে এর প্রতিফলন সুগভীর ও দূরাবগাহী। আমাদের বিচার সেখানেও অগ্রসর। সূত্রবন্ধ করা যায় এইভাবে।

প্রথম পর্ব ॥

…গাথা কবিতায়, ছড়ায় সাঁওতাল গণযুদ্ধ…

এক …অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা…

শুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর[১] হুকুম পেয়ে, সাঁওতাল ঝুকেছে
বেটারা কোক ছাড়িল—বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজার হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার।
হলো সব দুভ্যাবনা—হলো সব দুভ্যাবনা, রাড়কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়াঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।
বলে ভাই রাখিব কোথা—বলে ভাই রাখিব কোথা, জেথা সেথা, এই কথা শুনি
রাখেত মোলুক সলা যুলুক ভাবতেছে কোম্পানী।
বেটাদের সক্তি শোনে—বেটাদের সক্তি শোনে, প্রজাগণে, কইছে ধিরে ধিরে
জিনিষ ছেড়ে পালাও না ভাই সভাই থেক ঘরে
আমাদের আছে গোরা—আমাদের আছে গোরা, সঙ্গিনচড়া, জামা জোড়া গায়
বন্দুকেতে গোলি পোরা তুড়ুক স্বয়ার তায়।
বেটারা থাকে কোথা—বেটারা থাকে কোথা, সত্ত্য কথা, শুধায় তোমাদেরে
কেহ বলে দেখে এলাম মোরাক্ষির ধারে।
আছে সব জড় হয়ে—আছে সব জড় হয়ে, পুর্ব্বমুয়ে, তির মারিছে গাছে
কতশত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তিরের ফলি বানাইতে—তিরের ফলি বানাইতে, বরাত মতে, জখন জেমন
কয় হাতে হাতে যোগাইছে ফলা পাছে টানা হয়।
বেটাদের পোসাক চড়া—বেটাদের পোসাক চড়া, কপ্নীপরা লইতে বেড়া বুকে
ভাড়ের উপর পুজা করে কোক ছাড়িছে মুখে।
আগেতে লাগড়া পিটে—আগেতে লাগড়া পিটে, কাটে ছেটে, মদে ভাসে ভরা
প্রথমে বাঁষকুলি[২] দিয়ে পল্যগা জে ডেরা।

---

১. শুভবাবু='সুবাদার' শব্দের অপভ্রংশ। এখানে সিদু।
২. বাঁষকুলি=সিউড়ির উত্তরে বাঁশকুলি গ্রাম।

দেখে সব লোক পালায়েছে—দেখে সব লোক পালায়েছে, টোকা পেছে,
নয়ে নটাইথান
কেহ বলে রান্দা রইল বড় মাছের থান।
বলে ভাই পালা পালা—বলে ভাই পালা পালা, এ কি জ্বালা, করে কলরব
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্তমুখ সব।
আর কি হাকিম মানে—আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেলে শোজা
সাদিপুরে লোটাল গিয়ে কাপড়ের বুজা
জথা উচিত বুচকা বেন্দে—যথা উচিত বুচকা বেন্দে, নিল কান্দে, জত মনে ছিল
রাতারাতি হাতাহাতি কাপিষটাকে গেল
সকলি এমনী ধারা—সকলি এমনী ধারা, দেয়লাগড়া, অহর্নিশী পিটে খাবার
বেলায় সাঁওতালদের মেয়ে ছেলে জুটে।
বলে ভাই রাজা হব—বলে ভাই রাজা হব, টাকা পাব, করিয়া মন্ত্রণা
দুদিন বাদে পুড়াইল গিয়ে নাঙ্গুলের থানা
ঐ কথা শুনে—ঐ কথা শুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে
দারগা মুন্সির সঙ্গে দেখা হইল পথে।
মনেতে ভয় পেয়ে—মনেতে ভয় পেয়ে, পশ্চিম মুয়ে অগ্নি গেল ফিরে
পড়ের-পুরের মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে।
জত সব চেলের গোলা—জত সব চেলের গোলা, ভাঙ্গি তালা, সকল বার
করিল মরা পেটে চড়া দিয়া খিটন যে লইল।
তখন সিফাই ঘেরা—তখন সিফাই ঘেরা, সঙ্গিন চড়া, কাপ্তান সহিত
নদির উপান্তে আশি হইল উপনিত।
জত সব সিফাইগণে—জত সব সিফাইগণে, ভাবে মনে, হবে স্যার স্যার
দেখে শুনে মৌরাক্ষি উভয়ে না হয় পার।
তির বর্ষা ত্বয়ার আছে[১]—তির বর্ষা ত্বয়ার আছে, আপন সাজে, রণ নাইথ বাজে
নদির ধারে সাঁওতালরা লাগড়া বাজায় নাচে।
সেখানে সান্দ[২] কার—সেখানে সান্দ কার, পারাবার দুকুল বহে বাণ
হাতেতে কিরিচ ধরে দেখিছে কাপ্তান
দেখিয়া বহুত সেনা—দেখিয়া বহুত সেনা, কি মন্ত্রণা করে দুই জনে
বন্দুক ত্বয়ার রাখ কহে সিফাইগণে
দণ্ডচ্যার ছয় পরে—দণ্ডচ্যার ছয় পরে, কয় হল্যাদারে[৩] শুফেদারের প্রিতি
লির্ণয়[৪] করিতে দুরপীনে আন সিঘ্রগীত।

১. তির বর্ষা ত্বয়ার আছে=তীর বর্শা তৈরি আছে
২. সান্দ=সাধ্য
৩. হল্যাদারে=হাবিলদারে
৪. লির্ণয়=নির্ণয়

বলে উঠিল গজে—বলে উঠিল গজে, হাউদা মাঝে, নয়নে দূরপীন
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সাঁওতাল কোষ দুই তিন।
কিছুদূর পিছে হাট—কিছুদূর পিছে হাট, বলে ঝাট, সাহেব গেল চল্যে।
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পালায় পালায় বলে।
করিয়া বহু দম্ফ করিয়া বহু দম্ফ, দিল ঝম্ফ, পড়িল নদির জলে
সাতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে।
বলে সব মার মার—বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব।
জাব সব জেহালখানা—জাব সব জেহালখানা, দিব খানা, মুক্ত করিব চোরে
শুভবাবু রাজা হবেন জ্যজ সাহেবকে মেরে।
আমরা ঘুচিব মাঝি—আমরা ঘুচিব মাঝি, কাজের কাজি, মহুর করব বশ্যে
কৃষ্ণ শৌওর[১] দোকান ভেঙ্গে সয়াপ[২] খাব কশে।
বলে সিঘ্রত্তর—বলে সিঘ্রত্তর, আশুধর, আর বিলম্ব কেনে
কর্ম্মপাকে পলা সাঁওতাল সিফাএর মাঝখানে।
বেটারা তুচ্ছ্যজাতি—বেটারা তুচ্ছ্যজাতি, নাইখ বুদ্ধি কিবা জানে ঢের
আচম্বিতে হুকুম হাঁকে বলিয়া ফয়ের[৩]।
আলি হুকুম পেয়ে—আলি হুকুম পেয়ে, সিফাই জেয়ে বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাষ পঞ্চাষ গোলি মারে এককালে।
জেমন তারা খসে, আশেপাশে, তেমনি গোলি ছুটে
পিষ্টেতে বাজিয়া কারু পার হইল পেটে।
অন্য সাঁওতাল জত—অন্য সাঁওতাল জত, কতশত, পলাইয়া গেল
কুলি আট লয়[৪] সাঁওতাল তারা শেই দিনেতে মোল।
তখন পালায় সাঁওতাল—তখন পালায় সাঁওতাল, করিয়া বিকল,
পিছে নাহি চায় সলাখ পাহাড়ে জেয়ে শুভকে জানায়।
শুনে সব দুস্ক মনে—শুনে সব দুস্ক মনে, পরদিন কৈল একাকার
জাব্দ[৫] হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার।
নাহিক মৃত্যু ভয়—নাহিক মৃত্যু ভয়, সদারয়, ধেনুকেতে চড়া
লগর মোকামে জেয়ে বাজায় নাগেড়া।
শুনে সব লোক পলাইল—শুনে সব লোক পালাইল, বিসম্য হল্য, তামলি
পুদ্যার[৬] সতগোপ গোওলা পালায় কান্দে নয়ে ভার।

১. কৃষ্ণ শৌওর—কৃষ্ণ সাহা
২. সয়াপ—সরাব, মদ
৩. ফয়ের—ফায়ার 'গুলি'
৪. কুড়ি আট লয়—আংকিক হিসেবে, ২০৮৯
৫. জাব্দ—জামিনের অপর নাম
৬. পুদ্যার—পোদ্দার জাতি

পালায় সব বুড়াবুড়ি—পালায় বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি হাতে লয়ে লড়ি
মসুলমান ফকির পালায় মুখে পাকা ডাড়ি
মুখেতে বলে আল্যা—মুখেতে বলে আল্যা, বিষমল্যা, একি বেটাদের তির
এ বিপদে রক্ষা করছে সত্তপির[১]।
বলে প্রাণ জায়—বলে প্রাণ জায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মরিগ কোথা গেল।
জত সব মাথায় ঝুড়ি—জত সব মাথায় ঝুড়ি, কেঁথা ধুকুড়ি, উন্দু মুখে ধায়
হুঁজট[২] লেগে পোড়ে কেহ গড়াগড়ি জায়।
ঐ সাঁওতাল—ঐ সাঁওতাল, এল সাঁওতাল, কাটিলেরে সাঁওতালে
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে।
তখন হরষ্য মোনে—তখন হরষ্য মোনে, সাঁওতালগণে, রাজবাড়ী সোন্দায়[৩]
মানুষ কাটা পড়িল সেইদিন কুড়ি দুই আড়ায়।
পরে সাঁওতালগণ—পরে সাঁওতালগণ, হিষ্টমোণ, দেয় টাঙ্গিতে সান
লাওজোড়ে নারা বেটাকে দিল বলিদান।
গেল কুমড্যাবাদে—গেল কুমড্যাবাদে, সকল ফদে, হইল একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা কল্যে ছারখার।
পোড়াইলে ধানের গোলা—পোড়াইলে ধানের গোলা, তিলজুল্যা, সরিসা
আদি জত গরু মহিষ ছাগল ফেঁড়া পুড়িল কতশত।
পুর্ব্বে হনুমান—পুর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়।
ঐ গ্রাম নিবাস—ঐ গ্রাম নিবাস, সাধুদাশ, তার সঙ্গে জনাচারি
সিহুড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছ বিনয় করি।
আরত্য প্রাণ বাঁচে না—আরত্য প্রাণ বাঁচে না, কি মন্তনা, কহ্যেন হুজুর বস্যে
ঘরকর্ন্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে মেযে।
সিঘ্র উপায় কর—সিঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গির চোটে মোলুক কেটে পতিত কল্যে বোন
সাহেব ওস্যা মনে[৪]—সাহেব ওস্যা মনে, সিপাইগণে বলয়ে বচন
অতি সিঘ্র জাও তোমরা কর গিয়ে রণ।
কথা শুনে তখন—কথা শুনে তখন, জত সিফাইগণ, বন্দুক হাতে নিল
রাতারাতি সিফাইগণ কুমড়াব্যাদনে গেল।

১, সত্তপির—সত্যপীর
২, হুঁজট—হোঁচট
৩, সোন্দায়—প্রবেশ করে
৪, ওস্যা মনে—খোলস মনে

যন্দর্দ জেই মতে—যন্দর্দ জেই মতে, বিস্তারিতে, হবে বহুতক্ষণ
আকাশের চাঁদ ধরয়ে বামন।
বেটারা ধেনুক ধরে—বেটারা ধেনুক ধরে, তির মারে, করে মার [২]
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার।
সাহেব হুকুম দিলে—সাহেব হুকুম দিলে, ফয়ের বলে, যুন সিফাইগণ
হাজারে হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ।
অমনি ভগড়্যা হয়ে—অমনি ভগড়্যা হয়ে, পুব্বমুয়ে, পালাইয়া জায়
পাটজোড় মোকামে আসি নাগড়া বাজায়।
লাগড়ার সব্দ শুনে—লাগড়ার সব্দ শুনে, সব্বজনে, পালায় সত্তরে,
জনা দষ বাগিয়ে গোয়াল সেই দিনেতে মারে।
লোকের কি জন্তনা—লোকের কি জন্তনা, কি লঞ্জনা, কল্যেরে সাঁওতালে
কত গব্ভবতি রাস্তায় পুসুবিল ছেলে।
এমনি সর্ব্বস্তরে[২]—এমনি সব্বস্তরে, লোটকরে, বেড়ায় সাঁওতাল
মনিস্য কা কথা দেবতা পালান গোপাল।
ভাণ্ডিবোন ছেড়ে—ভাণ্ডিবোন ছেড়ে, পালান দোড়ে, পুজুরির মাথায়
বিরসিংহপুরের কালিমাএর বলিহারি জাই।
১২৬২ বারষ বাসণ্টী সাল—বারষ বাসণ্টী সাল, বরসাকাল বানের বড় বিন্দি
আব্দারপুরে মানুষ কেটে কল্যে গাদাগাদী।
কাটিলে বিষ্ণুপুরে—কাটিলে বিষ্ণুপুরে, হারা তাঁতিরে, প্রিয়েষুলার মাঠে
বিপিন গোপকে তিরিয়ে মারেল পথুরের ঘাটে।
লোটালে কুলকুড়ি—লোটালে কুলকুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লাগড়া দেয় সেশে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্যে আখবাড়িতে এসে।
পুঙ্গাতে দেয় বাড়ি—পুঙ্গাতে দেয় বাড়ি, উলঙ্গ করিয়ে
জাদু মাঝি চেনাপ[১] ছিল তেয় দিল ছাড়িয়ে।
ধল্যেচন্যা মাঠে—ধল্যেচন্যা মাঠে, পথুর কাটে, দাশী গোত্তালেনি
কাটের ভিতরে মাগি হারাল্য পরানি।
জত সব সাঁওতালগণে—জত সব সাঁওতালগণে, কাটের মোনে জত মাটী ছিল
ওখড়িয়া সকলমাটী চাপাইয়া দিল।
পরে ধেনুক ধরে—পরে ধেনুক ধরে, তার উপড়ে, নাচিতে লাগিল
ফুল্যাই পুরে ডাঙ্গালেতে সেফাই দেখিতে গেল।
আম্ম কোক ছাড়িয়ে—আম্ম কোক ছাড়িয়ে পশ্চিম মুয়ে পলাইয়া গেল
আলানচকের নন্দ্র দাশের গরু ঘেরি লিল।
তখন নন্দ্র দাস—তখন নন্দ্র দাস, করে হুত্যাষ, মাথায় ঘা মারে
বলে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আসিব ফিরে।

১. চেনাপ=চেনাজানা

তখন বস্তু ছাড়ি—তখন বস্তু ছাড়ি, কপ্নি পরি, সাঁওতাল সাজিল
চুন সুখানপাতে ভরি কড়চে গোজিল।
হাতে ধনুর্বান—হাতে ধনুর্বান, টাঙ্গিখান, কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতাল বুলি জানি এই সাহষ করিয়ে।
সাঁওতালের সঙ্গে—সাঁওতালের সঙ্গে, নানারঙ্গে, কথায় ভুলিয়ে
জলখত্তা ছলনা করি আনিল ছাড়িয়ে।
রাইকৃষ্ণ দাশে ভনে—রাইকৃষ্ণ দাশে ভনে, সংক্ষেপনে কিছু লেখা হল্য
বিস্তার নিখিতে হল্যে অনেক বাহুল্য।
কাএস্ত [২] কোলে জন্ম মোর রাইকৃষ্ণ দাশ
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয়জে নিবাষ।
জেলা বিরভূম তাহে নোনি পরগণা
লাটরাম তাহে নাঙ্গুলের থানা।
আমি ভাবি মোনে—আমি ভাবি মোনে, সাঁওতালগণে রাখিলে সুখ্যাতি
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ত সত্তি।
কথা মিথ্যালয়—কথা মিথ্যালয়, সত্ত হয়, এই জে বিবরণ
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ।
১২৬২ বারষ বাশষ্ঠী সাল—বারষ বাশষ্ঠী সাল, এই গোলমাল, বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্বাবনে।[৪]

আমাদের উদ্ধৃত কবিতাটির একটি অন্য পাঠও পাওয়া যায়। তবে উদ্ধৃত কবিতাটিতে অশুদ্ধ বানান প্রয়োগ মেলে, কবিতার মধ্যে যেমন ধুয়ো বা বিন্যাস রয়েছে অন্য কবিতাটির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মিল বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হুবহু-এক হলেও অমিল রয়েছে ঢের। 'সাঁওতাল বিদ্রোহের একটি গ্রাম্য কবিতা' নাম দিয়ে কুরুবিন্দ ভট্টাচার্য একটি সাহিত্য পত্রিকায় কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন।[৫] তিনি এর উৎস বলেননি। দুর্বোধ্য শব্দের অনুপ্রবেশের কথা বললেও অশুদ্ধ বানান নিয়ে কিছু বলেননি। এবং তাঁর উদ্ধৃত কবিতাটির যেন কিছু সংস্কার, পরিমার্জনা করা হয়েছে। এবং কিছু সংক্ষিপ্ত বটে কবিতাটি। যাইহোক, উভয় কবিতার মধ্যে সাঁওতালদের প্রতি রচয়িতার অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ে।

দুই. …সাঁওতাল হাঙ্গামার কবিতা…

ভাগলপুরের অধীনে রাজমহল।
সে রাজমহল থাম্য,
স্থান অতি মনোরম্য,
চৌদিকে পরিবেষ্টিত পর্ব্বত মণ্ডল॥

কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণনে না জায় ।
তার উপত্যকা ভূমে,
সাঁওতাল জাতি নামে,
বাস করে অল্প করে কৃষি করে খায় ।।
অসভ্য বর্ব্বর অতি বুদ্ধি নাই ঘটে ।
হলে কোন গণ্ডগোল
সেই বোলে দিয়ে বোল,
ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া সেই পথে ছুটে ।।

সাঁওতাল যোদ্ধাদের প্রতি কবির বিরাগ স্পষ্ট । তথাপিও কবি সাঁওতালদের মর্ম-যন্ত্রণা চিত্রিত করেছেন এ ভাবে ;—

রৌদ্রে শীতে জপে তাতে কষ্ট করি চাষ ।
কি দোষে সাঁওতাল জাতি
দুখে থাকে দিবারাতি,
উদর পুরিয়া অন্ন নাহি বার মাস ।।
বুদ্ধি বলে বাঙ্গালী ও যত হিন্দুস্থানী ।
আমাদের দেশে আসি,
আমাদের মধ্যে বসি,
আমাদেরি লয়ে সব হইয়াছে ধনি ।।
বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী
দেশ মধ্যে সব ধনী
আগে দন্ড দেওয়া চাই তাদেরি বিশেষ ।।
হাল ধরে চাষ করে বাবুগিরি নাই ।
এরা যদি করে দোষ
কভু না করিব রোষ ।
সাজা না পাইবে তারা সবে শুন ভাই ।।

সাঁওতালদের যারা সুখ কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য সিদু ও কানু দুই ভাই এক কৌশল অবলম্বন করেন ;—

এই দুই সহোদরে যুক্তি করি মনে
নিজ সম গুনধর,
জোটাই যে সহচর,
আরম্ভিল বুজরুকি আপন মনে ।...
হইত ঘণ্টার ধ্বনি তুলসীর তলে ।
কোথা থেকে কে বাজায়,
কেহ না দেখিতে পায় ।
হইল আশ্চর্য্যান্বিত সাঁওতাল সকলে ।।

দর্শন সাঁওতালগণ জিজ্ঞাসা করিলে
বলিত শিদ ঠাকুর
মোদের দুঃখ গেল দূর।
আসিয়াছে পরমেশ তুলসীর তলে ॥

সিদু ও কানুর মুখে অলৌকিক ঘণ্টা ধ্বনির ব্যাখ্যা শুনে সাঁওতালগণ সিদু ও কানুর নেতৃত্ব মেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কবির বর্ণনানুযায়ী দিনলিপি হলো ১৮ই আষাঢ় ১২৬২ সাল। দলবদ্ধ হয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা পাঁচক্ষেতিয়ার বটবৃক্ষ তলে সমবেত হলো।

বাঙ্গালা সন বারশত বায়ষট্টি সালে।
আঠারোই আষাঢ়েতে
চলে পাঁচকেঠে বটবৃক্ষতলে ॥
সেই বটবৃক্ষ রাক্ষসী দেবীর স্থান।
তথায় সাঁওতাল সব,
করে মহাবীর রব
দেবীরে প্রণাম করে সঙ্গীত গান ॥

সাঁওতালদের শুরু হয় দুর্বার অভিযান। মহাজনরা বিদ্রোহী নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য মদ নিয়ে যায়. মহেশ দারোগা মিষ্ট বাক্যে তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তাদের রুষ্ট মন শান্ত হবার নয়; বিরোধ-সংঘাত ঘনীভূত হয়। কবি বলেন: "বর্বর সাঁওতাল নানা কটু কথা কয়।"

এবং এর পর,

লুটিল বাড়েৎ বাজার কত হাজার পেয়েছে সব টাকা।
এ সকল বলতে পারে হিসাব করে নাইকো কারো লেখা ॥

মহেশপুর লুণ্ঠন সম্পর্কে কবি বলেন ;—

পেঁছিল সাঁওতাল সবে, উচ্চরবে, মহেশপুর গিয়ে।
লুটিল দুষ্টচয়, রাজালয়ে, ধনরত্ন নিল।
নিল নিল সব রেশমী-বসন, স্বর্ণ ভূষণ যেখানে যা ছিল ॥

কবির অবশ্য ইংরাজের শক্তি সম্পর্কে গভীর আস্থা ছিল। তাই কবির আনন্দ-বিস্ময়।

...দৈবেতে মহামান্য, রাজার সৈন্য মহেশপুর এলো।
করিল মহাধুম গুড়ুমগুম, বন্দুক ছুটিল ॥

কিন্তু কবির মনে কুণ্ঠা নেই যে, সাঁওতালরা বীরের জাত। যুদ্ধে তারা পরাঙ্মুখ নয়। যোদ্ধাদের সেই সাহসিক পরিচয় প্রদানে তাঁর আবেগ গম্ভীরতা লক্ষণীয়:

করিয়া দরশন সাঁওতালগণ ধরলো ধনুর্বাণ।
পাড়ি যে রহিল অস্থির, অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর প্রাণ ॥

তথাপি সাহস করে, সমর করে, রাজার সেনার সাথে।
মরে, সব উচ্চরবে, মহাহবে (মহারবে ?) বন্দুকের গুলিতে ।।৬

এরপর সিদ্ধু ও কানুর মৃত্যুতে সাঁওতাল যোদ্ধারা ব্যর্থ হয়। পরিশেষে কবি "সদাচারের উপদেশ" দান করে "ভারত গগনে ইংরাজ শারদ পূর্ণ শশীর" মহিমা কীর্তন করে ইংরেজের জয় ঘোষণা করলেন। কবিতাটির রচয়িতা রাজমহল মহকুমার পাঁচকেথিয়া বাজার চৌধুরী ধনকৃষ্ণ রুজ। এটি উনিশ শতকের শেষের দিকে রচনা বলে অনুমান করেছেন সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন. …সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া…

"শুন ভাই বলি সভাজনের কাছে
শম্ভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে।।
বেটারা কুক[১] ছাড়িল, জড় হৈল, হাজারে হাজার।
কখন আসে কখন লুটে থাকা হ'লো ভার।।

সাঁওতাল সৈন্যদের সঙ্গে বাঙালীদের অনেকেই যোগ দিয়েছে। কবির ভাষ্যে তার সমর্থন মেলে।

আছে সব জড় হয়ে পূর্ব্বমুয়ে তীর মারিছে গাছে।
কতশত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।।
তীরের ফলা বনাইতে, বরাত মতে যখন যেমন কয়।
হাতে হাতে জোগায় ফাল পাছে টানা হয়।।*

যোদ্ধাদের অগ্রগমন সম্পর্কে কবি বলেন ;

আগেতে নাগরা পিটে, কাটেছিটে, মদে মাসে ভরা।
প্রথমে বাঁশকুলী দিয়ে পল্ল গায়ে ডেরা।।
দেখে সব, লোক পালাইছে, টোকা পেছে, লয়ে লাটাইথান।
কেহ বলে, রান্ধ্যা রইল, বড় মাছের থান।।
বলে ভাই পালা পালা, একি জ্বালা, করে কলরব।
বেচারামকে কেটে বেটাদের রক্তমুখো সব।।
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে রাস্তা পেয়ে সোজা।
সাদিপুরে, লুটে গিয়ে, কাপড়ের বোঝা।।

১. কুক=চীৎকার, হাঁকডাক

* "বিদ্রোহী প্রদেশের যাবতীয় কামারেরা দিনরাত্রি বন্দুক নির্ম্মাণ করিতেছে ; বোধহয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে।"

দ্র, সম্বাদভাস্কর, ২১. ২. ১৮৫৬

সকলই এমনি ধারা, দেয় নাগরা, অহর্নিশ পিটে।
খাবার বেলায় সাঁওতালদের ছেলে মেয়ে জুটে ॥
লে ভাই, রাজা হব, টাকা পাব, করিয়ে মন্ত্রণা।
দুইদিন বাদে পুড়াইল লাঙ্গুলের থানা ॥
ঐ কথা শুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে।
দরগা মনসীর সঙ্গে দেখা হইল পথে ॥
বলে সব মার মার, ধর ধর, এইমাত্র রব।
আজ সিউড়ী জেলা লুটবো গিয়ে, করবো পরাভব ॥
যাও সব জোহালখানা, দিব থানা, মুক্ত করবো চোরে।
শুভবাবু রাজা হ'বে জজ সাহেবকে মেরে ॥
আমরা খুচবো মাঝি, কাজের কাজি, মহুরি করবো বসে।
কৃষ্ণ সাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব বসে ॥
তখন যত সাঁওতাল করে বিকলি পিছে নাহি চায়।
সলখে পাহাড়ে যেয়ে সভাইরে জানায় ॥
শুন সব দুখ মনে, পরদিনে হৈল একাকার।
জন্দী* হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার ॥
নাহিক মৃত্যু ভয়, সদারয়, ধনুকেতে চরা।
নগর মোকামে আসি বাজায় নাগরা ॥

কবির ভণিতা—

রায়কৃষ্ণ দাস ভণে, সাঁওতালগণে রাখিল সুখ্যাতি।
যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তা সত্যি ॥
কথ্যা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, শুন সকল ভাই।
হরি হরি বল সবে দিন ব'য়ে যায় ॥"[৭]

'অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা' ও 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'—একই ব্যক্তির রচনা। কিন্তু দুটি-ই আলাদা, পাঠে। কোথায় ও শব্দ অর্থের মিল আছে, আবার নেইও বটে। একটি কথা। দুটি কবিতাই সংগ্রহ করেছিলেন 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থকার গৌরীহর মিত্র। প্রথমটি তিনি নিজের গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, অপরটি পাঠিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে। দীনেশচন্দ্র সেন কবিতাটির বানান পরিবর্তন কিছু কিঞ্চিৎ করেছেন। তবে, তাড়াহুড়োর ফলে কবিতাটি 'পুর্ব্ববঙ্গ গীতিকায়' সন্নিবিষ্ট করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন ; এটি পশ্চিমবঙ্গে বিরচিত হলেও এরূপ একটি ভুল হয়েছে। যাইহোক এর ঐতিহাসিক দিকটি ও পরিবর্তিত পাঠ মনে রেখেই দুটি কবিতা স্বতন্ত্রভাবে উদ্ধৃত হলো।

* জন্দী > জন্দী = রাজমহলের আর এক পরিচয়

চার. …সাঁওতাল কাহিনী (বনবীর গাথা)…

'সাঁওতাল-কাহিনী' নামে একটি দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। গ্রন্থটির রচয়িতা লোকনাথ দত্ত। কর মজুমদার এণ্ড কোম্পানী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার থেকে ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক নিজেই বলেছেন; "সাঁওতাল-কাহিনী" কাব্য ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহ বা ইংরাজ-সাঁওতাল যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত। ইহার ঘটনা-সমাবেশ ও বর্ণনা, গ্রন্থকারের সাঁওতাল প্রদেশে অবস্থিতি, পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সাঁওতালদের সহিত সংমিশ্রণ হইতে সংকলিত।"

এতে আঠারোটি সর্গ আছে। তবে একাদশ সর্গ থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত সাঁওতালদের অসন্তোষ, মহাজনদের শোষণ পীড়ন, ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের গণসংগ্রামের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এবং ইংরেজদের রণসজ্জা, সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধ, সাঁওতাল সংহার, অবশেষে ইংরেজের জয়লাভ, সেনাপতির ঘোষণাপত্র ইত্যাদি নিয়ে কাব্যগাথা।[৮] এর কাব্যভাষা সুন্দর, অনায়াস সরল ও চিত্রকুশল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবি অবশ্য কল্পনার আশ্রয়ে ভর করেছেন তবে ইতিহাসের মূল কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত নন। সাঁওতাল ভূমি সম্পর্কে কবির বর্ণনা সরল ও আন্তরিক। কবি বলেন ;—

'উত্তর-ভারতে, বিন্ধ্যাচলপ্রান্তে,
ঝাড়খণ্ড দেশ, বঙ্গের সীমান্তে,
পঞ্চাশ যোজন, অর্ধচন্দ্রাকার,
উত্তর-দক্ষিণে, বিস্তার যাহার ;
উত্তরে জাহ্নবী, দক্ষিণে সাগর,
মধ্যপথে বহে পূত দামোদর ;
নদ ময়ূরাক্ষ, অজয়, সিলাই,
নদী স্বর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী, কাঁসাই ;
নীলগিরি-সীমা যাহার অবনী
যা'র প্রান্তরেখা পূত বৈতরণী ;
রাজমহলের দীর্ঘ শৈলমালা,
পরেশনাথের অভ্রস্পর্শী শিলা,
দুমকার গিরি, যার মধ্য-মেরু,
রাঁচী-মালভূমি যার জঙ্ঘা-উরু ;
সেই গিরিদেশ, কানন কান্তার,
স্বাধীন সাঁওতাল-জাতির আগার।' (পৃ. ১)

কবি দ্বিতীয় সর্গে, সাঁওতাল অসন্তোষের কারণ বর্ণনা করেছেন। এই অংশে কবির বর্ণনা ইতিহাসানুসারী।

'সাঁওতালে দুর্ব্বল হেরি বাঙ্গালী, বেহারী,
ঢুকেছে সাঁওতাল-গ্রামে খেলিছে চাতুরী ;
কোথাও বসেছে তারা ব্যাপারীর বেশে,
সাঁওতাল ক্রেতার ডাকে সমাদর হেসে ;
বেচিছে কাঁচের বালা ঝুটা মতি-হার,
বিলাতি বিলাস দ্রব্য, বিচিত্র বাহার ;
চারিগুণ মূল্যে তাই কিনিছে সাঁওতাল,
পরিবর্তে ঘৃত মধু শস্য বাঘছাল।
বেহারী ব্যাপারী আসি' সাঁওতালের হাটে,
কিনিছে সাঁওতাল-পণ্য, মিথ্যা তৌল বাটে ;
একসের স্থানে লয়, দুইসের তুলি,
প্রতারণা দাগাবাজি, মুখে মিষ্টবুলি।
সাঁওতালেরি ধনে পুষ্ট, দুষ্ট মহাজন,
সাঁওতালে অর্পিয়া ধন করিয়ে বন্ধন ;
অভাবে কৃষাণ লয়, ভুট্টা ধান-বাড়ি
দুচার বরষে ঋণ ক্রমে যায় বাড়ি ;
তখন কৃষাণ দেনা, শোধিতে না পারে,
দেয় ছাড়ি ক্ষেত-বাড়ী, মহাজন করে।' (পৃ. ১৮-১৯)

সাঁওতাল পল্লীর যুবকদের প্রতি ভৈরব সর্দারের যুদ্ধের আহ্বান, কেননা জমিদারেরা—

'বাড়াইছে দিন দিন রাজস্বের হার
না করে কোম্পানী এর কোন প্রতিকার ;
কোম্পানীর আদালতে সাঁওতাল-পীড়ন
রোধিয়াছে ঘাটোয়ার মুক্ত গিরিবন।
সাঁওতাল জাতির সর্ব্ব পূর্ব অধিকার,
ক্রমশঃ বিলুপ্ত, নাহি রাজার বিচার ;
মিটাইতে বিদেশীর ধনের পিয়াস,
স্বদেশে সাঁওতাল আজ ভূমি শূন্য দাস। (পৃ. ২৮)

অতএব যুদ্ধ চাই। যুদ্ধ-ই শেষ কথা। তাই যুদ্ধের গান ;

'প্রিয় জন্মভূমি, ঝাড়খণ্ড দেশ,
বিদেশী পীড়নে বিপন্ন আজ ;
চল্ চল্ সবে রণসাজে সাজি'
স্বদেশ উদ্ধারে জীবন দিই।...

দেশের উদ্ধারে, জাতীয় সমরে
আই ভাই প্রাণ ঢালি দিই ;
জয়-মালা পরে, কীর্তির মন্দিরে,
পশিয়া সকলে অমর হই ।
উঠ্‌রে উঠ্‌রে সাঁওতাল
যে যথা আছিস্‌ সাতকুলে ভাই,
'আবিবোঙ্গা' দেব ডাকিছে সমরে,
চল্‌রে সকলে ছুটিয়া যাই ।' (পৃ. ২৯-৩০)

পাঠক লক্ষ্য করবেন, জমিদার, মহাজন ও ইংরেজের শোষণ পীড়ন অনাচার বিনষ্টির বিরুদ্ধে সাঁওতালদের ব্যাপক জাগরণ ও প্রত্যাঘাত-চিত্রটিকে আমরা 'গণযুদ্ধ' বলছি ; সে কথার সমর্থন মেলে প্রায় সাত দশক আগে রচিত লেখকের 'বনবীর গাথা'টিতে। কবি বলেছেন 'জাতীয় সমর'।

বাগ্‌নাডিহির সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের ওপর দেবতার আশীর্বাদ সম্পর্কে কবি বিস্তৃত বলেছেন। দেবতার নামে চারভাই যুদ্ধে নেমেছেন। সরকারি রিপোর্টে-ও এমন তথ্য মেলে। চতুর্দশ সর্গে 'রণসজ্জা-সাঁওতাল শিবির দেব প্রেরিত নেতা' সম্পর্কে কবি অনেক বলেছেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল ;—

বাগ্‌না-ডিহি পল্লীবাসী, সিধু কানু ভৈরো চাঁদ,
সাঁওতালের মুক্তি-ভার, লইল পাতিয়া কাঁধ ;
স্বদেশ উদ্ধার কল্পে, চারিভাই এক প্রাণ,
দেবাশ্বাসে দৈববলে, আজ তারা বলীয়ান ;
জানে তারা কষ্টসাধ্য, বর্বর একতা আশা,
জানে তারা নৃশংস, বর্বরের প্রতিহিংসা ;
জানে তারা অসভ্যের, উশৃঙ্খল রণনীতি,
জানে তারা সুসভ্যের নরঘাতী যুদ্ধরীতি,
জানে তারা ইংরাজের একছত্র প্রভু-শক্তি,
কিন্তু জানে সাঁওতালের, আত্মভোলা দেশ-ভক্তি ।
জানে না সাঁওতাল বটে, সমরে দেখাতে পৃষ্ঠ ;
কিন্তু রণপরিণাম, চিরদিন অনির্দিষ্ট ;
তাই সে সাঁওতাল নেতা, স্বজাতির মুক্তির তরে,
আবেদন-পত্র-হস্তে, উপস্থিত রাজদ্বারে ।
জানাইলা আবেদনে, স্বজাতির নির্যাতন,
রাজা-মহাজন হস্তে, কৃষকের উৎপীড়ন ;
ঘাটোয়ালী-জমীদার রাজস্বের উচ্চ হার,
অতি সুদে ঋণ করে, কৃষকের হাহাকার ।...

সাঁওতাল এ দুর্দ্দশার চাহে আশু প্রতিকার,
রাজকর সুদ হ্রাস, ভূমি স্বত্বে অধিকার
আর চাহে অত্যাচারী, বিদেশীর নির্ব্বাসন
নাহি চাহে আদালত, পুলিসের উৎপীড়ন।
দেওঘরে ভাগলপুরে আসি' নেতা দুইজন,
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়ে দিলা দুই আবেদন ;
দিনলিপি ভাগল্‌পুর—কমিশনারের হাতে
পাঠায় চতুর্থ লিপি বড়-লাট দরবারেতে।
দরিদ্রের মর্ম্মক্লেশ জানায়ে রাজার পায়,
রহিল সাঁওতাল-নেতা উত্তরের প্রতীক্ষায় ;
দিন যায় পক্ষ যায়, ক্রমে মাসাধিক গত
সাঁওতালের আবেদন ছিন্নপত্র-টুকরী যাত।
না ডাকিল ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ না পুছিল কথা,
না বুঝিয়া বড় লাট সাঁওতাল প্রাণের-ব্যথা
ভারতে ইংরাজ দিল্লী-পাঞ্জাব বিজয়ী বীর
ঝাড়খণ্ড-দুঃখকথা শুনিতে আজ বধির ;
নিদাঘে নিশ্চিন্তে করিছে শৈল-বিহার,
কেহ সিম্‌লা, উৎকামন্দ, কেহ দার্জ্জিলিং পাহাড়।
পীড়িতের কাতরোক্তি, আকাশে মিলায়ে যায়,
অসভ্যের মর্ম্মব্যথা, সুসভ্য হেসে উড়ায়।
লক্ষণে বুঝিল শেষে, সাঁওতালে নেতৃগণ,
রাজপদে আবেদন, বৃথা অরণ্যে রোদন ;
ক্ষোভে পঞ্চায়েতে মিলি, কৈল তারা শেষ-যুক্তি
সাঁওতালের নিজ হস্তে, সাঁওতালের ক্লেশমুক্তি।

এরপর সাঁওতাল নেতারা যুদ্ধের দিনক্ষণ স্থির করেন।

পাঠাইল সাল-শাখা, সাঁওতাল-জাতীয় প্রথা,
সকলে জানিল তায়, যুদ্ধের আহ্বান-বার্ত্তা ;
যে মহাব্যাপার তরে, সকলে উদগ্রীব ছিল।
জাতীয় সমরোদ্যমে, আজি তাহা দেখা দিল।
আগঙ্গ আবৈতরনী ঝাড়খণ্ড দিল সাড়া,
সাঁওতালের রণসাজে, বাজিল মাদল কাড়া—

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ মিলন কেন্দ্র 'বড় হাট'-এ উপস্থিত হয়। এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে স্থির হয়, অস্ত্র নির্মাণ ও খাদ্যের আয়োজন প্রভৃতি এখানেই থাকবে বটে। তবে যুদ্ধ শিবির হবে পাঁচটি।

প্রথম শিবির,

ভাগলপুর "উপরবন্দে" "রক্সদঙ্গল" গ্রামে
প্রথম শিবির কৈল, হনুমান প্রসাদ ধামে ;

দ্বিতীয় শিবির,

ভাগলপুর নগরের উপকণ্ঠ পল্লীদেশে,
বরকন্দাজ সৈন্য-পূর্ণ, থানা নানুগুলিয়া পাশে,
বিদ্রোহী সাঁওতালদল, করিল দ্বিতীয় ছাউনী
চাঁদ ভৈরো দুইভাই, সেনানীর শিরোমণি ;

তৃতীয় শিবির

রাজমহলের পার্শ্বে, "সংগ্রামপুর" প্রান্তরে,
সাঁওতালীর বীরদল, আসিয়া ছাউনী করে ;
সিধু কানু এই দলে, নেতৃপদে নিয়োজিত,
বহু সহস্রেক যোদ্ধা, ক্রমে হেথা সম্মিলিত ;

চতুর্থ শিবির

চতুর্থ শিবির জমে "সিউড়ীর" নাতিদূরে,
তীলাবনী গ্রাম প্রান্তে, ময়ূরাক্ষ নদী তীরে,
ক্রমে সেথা সম্মিলিত সপ্ত সহস্রেক সেনা,
চারিপার্শ্বে গড়কাটি প্রাচীর কৈল রচনা ;
চতুর "সুন্দরা" মাজী, ক্ষত্রিয় "সারণবীর"
বরিত নেতার পদে নির্ভীক সমরে ধীর ;

পঞ্চম শিবির

পঞ্চম শিবির বসে দেওঘর নগর পথে'
ক্ষুদ্র বীরদল থানা হল্দিঘর পর্ব্বতেতে
দলে নির্ভীক নেতা "হেমব্রোম" রামা মাজী',
রোধিয়াছে গিরিপথ পরাক্রান্ত দস্যু সাজি
এই পঞ্চ শিবিরেতে সাঁওতাল সেনানী-দল
যুবক সৈনিক-সংঘে শিখাইছে অবিরল,
সুসভ্য-সমর-প্রথা, কুচকাওয়াজের রীতি,
আক্রমণ, ব্যূহভেদ, সিপাহীর রণনীতি,
লঘু হস্তে তীরক্ষেপ, সুদূর লক্ষ্য-সন্ধান
বর্শা হস্তে দ্রুতগতি শত্রুপতি অভিযান ;
অথবা কানন পথে, আকস্মিক আক্রমণে,
কেমনে জুঝিতে হয় দুর্গম পর্ব্বতে বনে ;
কেমনে লুঠিতে হয় সিপাহী রসদ-গাড়ী,
কিসে অধিকৃত হয় শত্রুপক্ষ কেল্লাবাড়ী ;

পলায়িত শত্রু পিছে ধাবন বন্ধন-রীতি ;
প্রবল বৈরীর আগে কিসে পলায়ন নীতি ;
কেমনে রক্ষিত হয় আপনার গ্রাম দুর্গ,
কেমনে কাটাতে হয় সমরের উপসর্গ ;
কেমনে আহতজনে বাঁচাইবে রণস্থলে,
কি করিবে কোথা যাবে, আপন বিপদ্-কালে
কি কৌশলে যুদ্ধস্থলে, ক্ষুধা পিপাসার শান্তি
বীরের কর্ত্তব্য কি বা, নিরস্ত্র বিপন্ন প্রতি ঃ—
কহিলা সেনানী হেন রণ-প্রসঙ্গের কথা.
শিখাইলা রণ-জয়ে প্রবীণ সৈনিক-প্রথা। (পৃ. ১৫৫-১৬২)

এরপরের সর্গগুলিতে যুদ্ধ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। ভাগলপুরের যুদ্ধ, সংগ্রাম-পুরের যুদ্ধ কাহিনী সবিস্তারে বলা হয়েছে, স্থাননাম ও ব্যক্তিনাম যা' উল্লেখিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থে তা ইতিহাসানুগ। যুদ্ধের খণ্ডচিত্রে, আমরা লক্ষ্য করি, কোথায়ও সাঁওতাল সৈন্যরা জয়ী কোথায়ও বা ইংরেজ সৈন্য। তবে অসম যুদ্ধে সাঁওতাল যোদ্ধাদের পরাজয় হলোই। এবং সেটাই নির্দ্ধারিত ছিল। অসম যুদ্ধ বলছি এই কারণে। অস্ত্রশস্ত্র, কামান, গোলাগুলি ও সুশিক্ষিত সৈন্য ইংরেজের ক্ষেত্রেই ছিল। এই আরণ্য অধিবাসীরা এ ভাবে যুদ্ধের জন্য কখনও প্রস্তুত হয়নি। লড়াই তারা দিয়েছিল প্রাণের আবেগে ; সম্মিলিতভাবে। এই সম্মিলনের মধ্যেই গণমনের লক্ষণ টের পাই। তাই তারাও ইংরেজের দলন, নিষ্পেষণের যোগ্য জবাব দিয়েছিল তীরন্দাজি-প্রক্রিয়ায়, গেরিলা কৌশলে। মূলত ইংরাজ পক্ষেও ক্ষতির পরিমাণ কম নয়, যখন রক্ত বিন্দুর তুল্যমূল্য চলে না।

পাঁচ. ···একটি গাথা···

এক অজ্ঞাতনামা কবির রচিত একটি গাথার সন্ধান দিয়েছেন অজিত কুমার মিত্র। তাঁর 'গাথা গীতিকায় চিরন্তনী বাঙলা'-তে এটি সংযোজিত। তবে তিনি এটিকে 'লোকগীতি' বলেছেন। কিন্তু কাহিনী আখ্যানমূলক, মৌখিক রূপ, মিশ্র ভাষারীতি এবং ধুয়ো দেখে আমরা এটিকে গাথারূপেই চিহ্নিত করতে পারি। এর মধ্যে সাঁওতালদের অগ্রগমন, লুণ্ঠন, পতন-মৃত্যু প্রভৃতির খণ্ডচিত্র মেলে বটে, তবে রস কিছুটা ফিকে। কবির কৃতিত্ব এই যে, তিনি খানিকটা বাস্তব ছবি দিতে পেরেছেন।

১২৬২তে উত্তরেক্তে উৎপাত জাম্মল।
আমীর মুলুক থেকে সাঁওতাল জুটিল ॥

বেটাদের একান বড় মাঝি ঘড় সেখানে ছিলো।
আড়াইশ' গ্রামের সাঁওতাল একত্র হইল॥
করলে পরামর্শ মনে হর্ষ মুলুক মারবার তরে।
ইংরেজ মারিয়ে আমরা রাজ্য লিব[1] কেড়ে॥
পাঁচপিঠের পাহাড়ে সব একত্র হইল
সাজ সাজ ডাক সাঁওতাল সেখান হতে দিলো
কথা ধার্য্য করে পাহাড় ঘেরে পাঁচপিঠের গ্রামে
মারুত বাঁধব আমরা সুভবাবুর নামে॥
সুভরা তিনভাই শুনতে পাই শুন সবে ক্রমে।
সিধু কানু দুই ভাই ফাগু মাঝির নামে॥
করলে হুকুম-জারি আমাদের জাতি ওরে।
ডাল ঘুরিয়ে নেওতা দোব সবার ঘরে ঘরে॥
বেটাদের হাসি খুসি বসি বসি করে মন্ত্রণা
ভাই এসে পোড়াইলে লাঙ্গুলের বাজা (বাজার ?)
ঢুকলো বাঁশকুলি, কুলি কুলি বাজিয়ে নাকাড়া।
বাঁশরা, মুলুক, তালবেড়ের লোক হলো ভাগোড়া॥
পাঠান্তর : বাঁশকুলি কুলি কুলি বাজায়ে নাকড়া
উদাসিনী কামবাসিনী হইল ভাগোড়া॥
লুটলে রামপুর, কাঠিপুর আর বেদনারায়ণপুর।
পাহার রাজার মাটি লুটলি কত দুর॥
পরেরপুরের[2] ঘরে ঘরে কাটিল বিস্তর
ভাণ্ডিবনের গোপালঠাকুর মনে পেয়েছে ডর॥
ঘরবাড়ী কুড়ি কুড়ি ভাঙ্গলে দালান কোঠা।
কুমড়োবাদের লোকগুলোকে করলে কুমড়ো কাটা॥
দু'জনা রাজপুত যমের দূত ঢাল কাঁধে করে।
তাই সাহেবরা পলাই ছুটে মুরগী কাঁধে করে॥
আল্লারাখ জান মেহেরবাণ সিন্নী দোব কোথা।
ফুলবাগানে কাটলে এসে তৌসিলদারের মাথা॥
বেটাদের একবুলি কুলি কুলি দেয় না ঘরের কাঠি।
সাত হাজার সাঁওতালে লুটলে মহেশপুরের মাটি॥
রাজা প্রাণভয়ে রাণী লয়ে পলায় দক্ষিণে।
সাঁওতালের হাতে পুত্র ত্যজিল পরাণ॥

১, নিব > লিব, বীরভূমের উচ্চারণরীতি লক্ষণীয়
২, পরেরপুর—পরিহারপুর, সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রাম-নাম

ওহো হরি মরি ধিক আমাদের প্রাণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গেলেন বন্দমান[১]।
রক্তে ভাসলো নদী হাদি গাদি শুনে সভে ভাই
ধনুক ধরিয়া আমরা ইংরেজ মেরে যাই ।।
ইংরেজ পিছু হলো তোপ গাড়িল তোপে দিল টানা।
আড়াইশ' গ্রামের সাঁওতাল নায়ক একজনা ।।
পাঁচশ' হাতি তুরুপ গাঁথি আনিল বিস্তর।
লি সাঁওতাল[২] করবো আজ পৃথিবী ভিতর ।।
সাঁওতাল কাটা গেল ভালই হলো করো গো বিকুলি।
সাঁওতালদের মেয়েগুলো বেড়ায় কুলি কুলি ।।[৯]

ছয়. ...সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া...

"পাহিলে দক্ষিণ জঙ্গল থা বাঘ ভল্লুক কা বাসা,
সাঁওতাল লোক সাফা কিয়া সাবিক দেশ এইসা।
এক বিঘা জমি নেহি থা দামিন কোলমে,
লাখ বিঘা জমি হুয়া দেখ নজর।
আট আনাকে দরসে পশচাশ হাজার শাল,
এইসা প্রজা অবিচারমে হোগা বেহাল।
গোলাদার বাঙ্গালী দামিনের মহাজন,
তাদের কাছে কর্জ নেয় সাঁওতাল প্রজাগণ।
শ্রাবণমাসে এক টাকা নিলে ;
আটমাসে তার একুশ টাকা হলো।
বারটাকায় চুরাশি টাকা একুন করিয়া,
গরু বাছুর সব তাদের লয় ডাকাইয়া।
দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে,
সেও বলে শালার বেটা টাকা দিতে হবে।
এইরূপে ধন মোদের সকল হরে নিলো
এইজন্য দামিনীতে হাঙ্গামা হইলো।"[১০]

১, বন্দমান—বর্ধমান শহর

২, লি সাঁওতাল>নি সাঁওতাল অর্থাৎ সাঁওতালহীন

সাত. ...সাঁওতালদের লড়াই...

"দশটি হাজার সাঁওতাল ঐ পথ কাঁপিয়ে হাঁটে ;
চল'ছে তারা শপথ নিতে ভাগ্না ডিহির মাঠে।
রণসাজেই চ'ললো সেজে তীর-ধনুকে তারা :
বাজায় মাদল, সাথে বাজে কাড়া আর নাকড়া।
ভাগ্নাডিহির মাঠে গিয়ে কিসের শপথ নেবে ?
শোষণ-পেষণ সইবে না আর, না হয় জীবন দেবে।
একশো পঁচিশ বছোর আগে, দিন তিরিশে জুন ;
লাখো চোখে উঠলো জ্বলে ঘৃণায় সে আগুন।
বললো তারা জেনে রাখো—ইংরাজ সরকার
নেবোই নেবো কেড়ে মোরা আপন অধিকার।
শপথ নিয়ে চ'ললো মিছিল কলিকাতার পানে ;
নারী-পুরুষ ঘর ছেড়ে সব নামলো অভিযানে।
সিদো-কানহু দু'ভাইয়েতে সবার আগে চলে ;
শোষক-পোষা সরকার তাই আতঙ্কেতে টলে।
পিছু হ'টে, রাজার-সেনা ঠিক পরাজয় মানে ;
সাঁওতাল বীর এগিয়ে চলে—ভয় কী, নাহি জানে।
বিদেশী-রাজ বাঁচাতে তাই দ্বিগুণ সেনা আসে ;
দেশী রাজা দাঁড়ায় এসে বিদেশীদের পাশে।
ইংরাজেরা চালায় গুলি রাজা চালায় হাতি ;
সাঁওতালদের সামনে নামে বিপদ রাতারাতি।
বীরের মতন ল'ড়েই তারা মানলো পরাজয় ;
তাদের লড়াই চাষীর বুকে সাহস হয়ে রয়।
সেদিন থেকেই চ'লছে লড়াই, চরম লড়াই আজ ;
থামবে লড়াই কায়েম হ'লে সর্বহারার রাজ।"[১১]

দ্বিতীয় পর্ব ॥

সাঁওতাল গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া—উপন্যাসে

এক ···ভাগনাদিহির মাঠে···

সাঁওতাল যুদ্ধের বিষয় অবলম্বন করে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী রচনা করেছেন 'ভাগনাদিহির মাঠে'। লেখক বলেছেন : "সাঁওতাল বিদ্রোহের চমকপ্রদ ঘটনাবলী অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধরনে একটা কিছু দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। —বইয়ের উল্লিখিত চরিত্রগুলি বা তাদের বর্ণনা যাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় তারজন্য ঐতিহাসিক কাঠামোকে আমি সম্পূর্ণ বাস্তব রেখেছি। লেফটেনাণ্ট জোন্‌সের চরিত্র কল্পিত হলেও অবাস্তর নয় এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোন অমিল নেই।" (বক্তব্য অংশ)

ভাগনাদিহির গ্রামের অবস্থান প্রসঙ্গ দিয়েই লেখক উপন্যাস শুরু করেছেন। বর্ণনা সমুজ্জ্বল। "বার হাইত-এর পাশ দিয়ে গোমানী নদী আর দক্ষিণ দিক কিছুটা দূরে দলুদলি পাহাড়ের মাঝখানে বড় রকমের সাঁওতাল বস্তি ভাগনাদিহি। এখানে দুশো ঘরের বেশি সাঁওতালের বাস।" (পৃ. ৪)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সাঁওতাল অধিবাসীদের দেহ সৌন্দর্যে লেখক আকৃষ্ট হন। তিনি তাদের প্রাত্যহিক জীবন চর্যার কথা আমাদের শোনান। এক্ষেত্রে, তিনি উদারতম ভাবুক।

প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করি, ভাগনাদিহির বংশানুক্রমিক মোড়ল পরিবারের সন্তান সিদু ও কানু ক্রোধে ফোঁসেন। তাঁরা নিবিড়-নিবিষ্ট চিত্তে অন্যান্য পরগণাইতদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। লছিম পুরের পরগণাইত বীর সিং মাঝি উত্তেজিত কণ্ঠে সমস্যার গুরু আকার বোঝাতে গিয়ে বলেন : "সিধু, তুর খবর আওর হামার খবর এক, পন্টেট সায়েবটা দশগুণ খাজনা বঢ়াতে চায়।" সিদুর অপ্রসন্নতা লক্ষণীয়। "সায়েব লোক আদমি পিছু খাজনা ঠিক করে লিতে চায় আওড় সোমাজটো তুড়ে আদালতের বিচার কায়েম কোরতে চায়। উয়ারা হেইটা কোরলে পোর ভি হামারার জমি-জেরাত, ঘর-সন্‌সার বরবাদ হোবে, ফির ভি হামারাদের পথে দাঁড়াতে হোবে ;" (পৃ. ৬)

পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে সাঁওতালদের গণঅসন্তোষ ধরা পড়ে ; সিদু তাঁর স্ত্রী লখিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপনেও আসন্ন বিপদের আভাস দেন। এই পরিচ্ছেদে লেখক সিদুর পরিবার প্রীতি ও স্বজাতিপ্রাণতাকে চিত্রিত করেছেন। কানুর স্ত্রী মুনিয়া ও তাদের দুই পুত্র ভজা ও নন্দুর কথা উপন্যাসে ঝলমল ও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য তারা সবাই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখছি, সাঁওতালরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে। সাহেব, মহাজনদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ হচ্ছে। তাই মহাজনদের

ওজন বাটখারা 'কেনারাম' ও 'বেচারাম' তারা বাতিল করে। সাঁওতালরা এর নাম দিয়েছে 'বড়-বৌ' ও 'ছোট-বৌ'। কানু মহাজন দিগম্বরকে শাসিয়ে বলেন, কোম্পানীর ছাপমারা আসল বাটখারা দিয়েই জিনিসপত্র ওজন করতে হবে। শুরু হয় তাদের অনন্য প্রতিবাদ। অ-সাঁওতালীয়দের সঙ্গেই তাদের বিরোধ। অথচ সিদু সকলকেই বলেছেন : "গরীব দিকুদের সাথে হামাদের কুনো ঝগড়া লেই।" (পৃ. ২২)

দেশকাল, সমাজ নিয়ে আরম্ভ হয়েছে চিন্তাভাবনা। লড়াই করার তাগিদ অনুভব করে সকলেই। বীর সিং নরমপন্থী নন। তিনি শোষকদের ঘরে লুণ্ঠন করার কথা ভাবেন। সিদুর তাতে আপত্তি। কিন্তু "অতি সাবধানী সুন্নু মোড়লেরও মনে হল যে এই সংঘবদ্ধ আনন্দের সম্বল নিয়ে নিশ্চয়ই লড়াই করা যায়।" (পৃ. ৩৩)

উপন্যাসের ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা সিদু ও কানুর রণমূর্তি'র সঙ্গে পরিচিত হই। সিদু সংগ্রামী অভিজ্ঞতা সুদৃঢ় করতে পাটনায় গেলেন ওহাবী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হতে। তিনি জেনেছেন বাংলা দেশের নীলসংগ্রাম, তিতুমীরের সংগ্রাম ও ফরাজী আন্দোলনকে। গ্রামের সুবৃদ্ধ ভাদু মোড়ল বড় বোঙার স্বপ্নের কথা বিবৃত করে সাঁওতালদের প্রেরণা দেন, যুদ্ধের আহ্বান জানান।*

১৮৫৫-এর ৩০শে জুন। ভাগনাদিহির প্রান্তরে জমায়েত বিশ হাজার সাঁওতালের কণ্ঠ গর্জে ওঠে। সিদুর বক্তৃতা সকলকে কাঁপন ধরায়। "এই মুলুক হামরার মুলুক। সাঁওতাল, মেহনতি বাঙালী, বিহারী আওর মোমিন জোলাদের মধ্যে কোনও ফারাক···আমরা আসতে দিবকলেই। সোব দুশমনদের হেই মুলুক থেকে খেদাব। বড় বোঙার হুকুম জরুরত মাফিক জান দিব আওর জান লিতে ভি হোবে। সায়েবরা বরবাদ, জিমিদার মহাজন বরবাদ, নীলকর বরবাদ।" (পৃ. ৬৪)

অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে এসে আমরা লক্ষ্য করছি, বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সামরিক জল্পনাও শুরু হয়েছে। রিচার্ডসন, পনটেট, কমিশনার ব্রাউন সাহেব সকলেই বিচলিত। বিদ্রোহীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেনাপতি বারোজ বিপদাপন্ন। মহেশ দারোগা হত। দামিন-ইকো ছিন্ন ভিন্ন। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বড়োলাট ডালহৌসী সাহেব সাঁওতাল সৈনিকদের তৎপরতায় শঙ্কিত। সামরিক শাসন বা মার্শাল 'ল জারির কথা ভাবলেন কমিশনার সাহেব। হ্যালিডে সাহেব সাঁওতালদের বিরুদ্ধে সমরাভিযানের নির্দেশ দিলেন। তাদের অন্য সব জেলার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথাও বলা হল। তারা ধ্বংসের অভ্যর্থনা জানাল, সৃষ্টির নয়।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর একটি অনন্য সৃষ্টি—তাঁর কল্পিত সৈনিক জোন্‌স। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কোথাও তরল-চপল নয়। এই কল্প-সৈনিককে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে বিবেকবর্জিত কাজের সমালোচনা করেছেন কখনও স্বগতোক্তির মাধ্যমে বা ডায়ারি

* ইতিহাস পর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, সিদু ও কানু ঠাকুরের অলৌকিক নির্দেশ ব্যাখ্যা করেছেন। এই উপন্যাসে, বড় বোঙার স্বপ্নের কথা স্বীকৃত হয় মাত্র।

রচনার বস্তুগর্ভ বচনে। আসলে, জোনসের অন্তরাল সহানুভূতির মধ্যে লেখকের ইমোশন ধরা পড়ে, কবি-মনের মাধুর্য মুখ্য হয়।

শেষ পরিচ্ছেদে, যুদ্ধের দুই সেনাপতি সিদু ও কানুকে হত্যা করা হয়েছে। সিদু আগে ও কানু পরে। প্রাণ হারিয়েছে আরও অনেকেই। সিদু কানুরই সুজন-স্বজন। জোনসের ডায়ারিতে মৃত্যুর পূর্বে কানুর অগ্নি-ভাষণ: "হামী দুষী? তুরা হামার বিচার কুরবি? হেই চারপাশের জমিন কার মেহনতে পয়দা হয়েছে? জুয়াচুরি করে হামারার জমিন কে ছিনিয়ে লিছে?...তুরা ইংরেজরা, তুরা জিমিদারেরা, তুরা সাহুকরেরা, তুরা নীলকরেরা, তুরা সোবাই বেইমান। হামরা মেহনত করিয়ে খাই,—হামরা সান্তাল, দিকু, বিহারী একসাথ মিল্লত করিয়েছি; হামরা নিজেদের হক আওর ইজ্জৎ নিয়ে লড়েছি আওর এখুন ভি লড়াই চোলবে। ...শেষমেষ মেহনতী মনিষ,—সান্তাল, দিকু, বিহারীর জিত হোবেই। আওর তেখুন তুদের বিচার হোবে, তুদের সাজা হবে।...সেদিন হামারার লড়াই শেষ হবে।" (পৃ. ৯৭-৯৮)

কাল্পনিক ডায়ারির ভাষা হলেও, এরকম-ই ছিল তাদের অন্তরের কথা। উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের সামাজিক ইতিহাস, আনন্দ বেদনার ইঙ্গিতটুকু বাদ দিলে ইতিহাসের তথ্যাবরণই বেশি। অবশ্য ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব এই মাত্র যে, তিনি আমাদের যুদ্ধের পটভূমিতে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন রচনার মনোহারিত্বে ও কল্পনার কারিগরিতে।[১২]

দুই. ...আরণ্যক...

'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় সাঁওতাল যুদ্ধের এক বীর নায়কের কিছু কথা শুনিয়েছেন। তিনি হলেন সাঁওতাল রাজা দোবরুপান্না বীরবর্দী। কথাসাহিত্যিক দরদভরাতুর ও সহানুভূতিশীল চিত্তে অরণ্য রাজার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। "মুঘল বাদশাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২* সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরুপান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এদেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।"

লেখক রাজ সন্দর্শনে এসে বীর দোবরুপান্নাকে প্রত্যক্ষ করলেন। তীব্র দারিদ্র্যের

* সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৬২তে নয়। সম্ভবত বঙ্গাব্দ ১২৬২ স্থলে ১৮৬২ ছাপা হয়েছে। যে কোনো ভাবেই হোক না কেন এটি অনবধানবশত হয়েছে।

মধ্যেও রাজা প্রচ্ছন্ন গর্ব নিয়ে বেঁচে আছেন। রাজার অতীতচারণা এরূপ : "আমাদের বংশ সূর্য্যবংশ। এই পাহাড় জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবনে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়েস অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।"

দোবরুপান্নার সহজ-প্রকৃতি, রাজঔদার্য, বীরত্ব কাহিনী তাঁর আতিথেয়তা লেখক গভীর অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। লেখক রাজসন্দর্শনে গিয়ে যে আনন্দানুভব করেছেন তার সরল বিবৃতি দিয়েছেন। রাজ-প্রসঙ্গে ও রাজার নাতির মেয়ে ভানুমতী বিভূতির কবি-মনকে অধিকার করে। ভানুমতীর অনায়াস সারল্য, মুক্ত মন, নিষ্কলুষ চরিত্র সর্বোপরি কল্যাণময়ী নারীর অপরূপ সান্নিধ্য লেখককে কয়েকবারই দোবরুপান্নার রাজধানী চকমকিটোলায় টেনে নিয়ে যায়। কবির মনে হয়েছে প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনই সংকোচহীন, সরল বাধাহীন। "অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়েছে দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত,দৃঢ়,উদার।" আবার লেখকের সহানুভূতির সঙ্গে আমরাও একাত্ম হই, যখন অনার্য রাজা, সাঁওতাল যোদ্ধা দোবরুপান্নার মৃত্যু হয়। তাই লেখক পরম দুঃখে রাজ-সমাধির ওপর ফুল ছড়িয়ে দেন তখন অলৌকিক পরিবেশ যেন, "ভানুমতী ও রাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত অত্যাচারিত প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু! কারণ আর্য-জাতির বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সন্তান অনার্য্য রাজ-সমাধির উদ্দেশ্যে।"[১৩]

কেবলমাত্র ইংরেজ নয়। আর্য অহমিকায় অনার্য সাঁওতালদের ওপর পীড়ন-শোষণে হিন্দুরাও কম যান নি। তাই, লেখক একজন অখ্যাত সাঁওতাল যোদ্ধার কবরে ফুল নিবেদন করে হিন্দু জাতির পক্ষে কলঙ্কিত অধ্যায়ের জন্য কিছুমাত্র অনুশোচনা ও দোষস্খালনের চেষ্টা করলেন। সুতরাং আরণ্য পটভূমিকায় কথা-সাহিত্যিক 'আরণ্য'-কে মনুষত্বের মহিমাকেই প্রকাশ করেছেন অনায়াস-সারল্যে।

তিন. ···অরণ্যবহ্নি···

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন একটি উপন্যাস—'অরণ্যবহ্নি'।[১৪] ঔপন্যাসিক বলেছেন, চরণপুরের (বীরভূম) প্রতিমা কারিগর নয়ন পালের কাছে পট* ও ছড়ার মাধ্যমে শুনেছিলেন সাঁওতাল যুদ্ধ-কাহিনী। নয়ন পাল তাঁর পিতার কাছ থেকেই পটচিত্র পেয়েছেন ছড়াও জেনেছেন। পটসংস্কৃতির সরস উত্তরাধিকারী তিনিই। তিনি পটচিত্র মেলে ধরে ক্ষণোদ্ভাসিত রূপ আঁকলেন। ঔপন্যাসিক তারই তথ্যরস পরিবেশন করেছেন।

* সিদুকানুর ফাঁসির একটি পটচিত্র গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

উপন্যাসের পটভূমি পাঁচকাটিয়া, বারহেত, 'বাগানাডিহি' ও লিটিপাড়া প্রভৃতি স্থান। এতে আছে সাঁওতালদের সামাজিক জীবনের বিস্তার। দৈনন্দিন জীবনচর্চা। সুখ-দুঃখের বহু কথন। পারিবারিক সমস্যা। সিদু-কানুর বিবাহ। অন্যনারী রুকনী ও টুকনীর সঙ্গে সিদু ও কানুর প্রেম-বিরহ। সিদু-কানুর বোন মানকীর পলায়ন, ধর্মান্তরিতা হওয়ার জ্বালা প্রভৃতি। তাদের পিতা চুনার মুর্মু গ্রামের মাঝি। দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি তাঁর মান-মর্যাদা সম্পর্কে'ও অতি সাবধানী।

সাহেব, মহাজনদের অকথ্য শোষণ-নির্যাতন, মহেশ দারোগার জুলুম-অত্যাচার, ইংরেজ শাসকদের উদ্ধত আচরণ, নারীহরণ, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি সাঁওতালদের হিংস্র করে তোলে। মহাজনদের কাছে ঋণের দায়ে বংশ পরম্পরায় দাসবৃত্তি, জমিজায়গা সম্পত্তি হারানোর যে তথ্য-বিবৃতি উপন্যাসে মেলে তা ইতিহাসের ধারা অনুসারী। এক্ষেত্রে,লেখক হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থ ও সংবাদ প্রভাকরের পাতায় চোখ রেখেছিলেন। নয়ন পাল পট দেখিয়ে লিটিপাড়ার দুর্জন মহাজন কেনারাম ভগতকে চেনান। যার কাছে দাদন নিয়ে চিরজীবনের গোলাম হয়ে গেছে সাঁওতালদের অনেকেই। "দাদন দেনার মুনিষ হলো কেনা মুনিষ। দশটাকা ধার নিলে এক মুনিষ জনমকার মত বিকিয়ে যেত,…এই শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজনের বাড়ি খাটতো। পেটভাতা। মজুরি নগদা নাই। তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না; মরলেও না তার ছেলেপুলেদের শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিল না; তখন জঙ্গিপুরে 'মুনসুবি' আদালত, সেখানে নালিশ করে ডিগ্রি করে পরওয়ানা এনে গ্রেপ্তার করে জেল খাটতো।" (পৃ. ২৪)

এসব কারণে, সিদুর মনে কঠিন শপথ জাগে। সাঁওতালদের দেবস্থান জহর সর্ণার কাছে সে শক্তি প্রার্থনা করে। সিদু-কানুর অভিব্যক্তি, দীপ্ত তেজ সম্পর্কে নয়নপাল কালকেতু বিরূপাক্ষের ঐশী শক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, "যখন পাপ বাড়ে, পাপীর দাপ বাড়ে—ধম্ম যায়—মানুষের ঘরে জীবনে অধম্মের একাকার হয়, তখন মা কখনও নিজে আসেন, কখনও তাঁর ওই কালকেতু বিরূপাক্ষকে পাঠান।"

নয়ন পাল ছড়া কাটেন: "সাঁওতালেরা ফোঁসে হায় (যেন) অজগর গরজায়।"

তাই সিদু কানু বলছেন: "আমাদের ধরম লিছে, আমাদের মেয়া লিছে, আমাদের ধান লিছে গরু লিছে কাঁড়া লিছে, চাকর করে রাখছে—আমরা কাটব।" কারণ, "সিধু বললে ই আমাদের দেশ বটে। ই দেশটো আমাদের। ই আমাদের দেশ, আমরা লিব…সিধুর সঙ্গে কানু একসঙ্গে বলে উঠল—হুঁ, ইটো আমাদের দেশ বটে। আমাদের দেশ।"[১৫]

অতএব যুদ্ধ চাই। ঠাকুরের নির্দেশও তাই। অন্যায়, অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধেই তাদের লড়াই। স্বাধীন দেশ গড়ার আহ্বান নিয়ে তারা ঠাকুরের নির্দেশ সাঁওতাল জনসমাজে প্রচার করল। যুদ্ধ শুরু হয়। সিদু ও কানু সুভোবাবু

(রাজা) হয়েছেন। তাঁরা হূল (বিদ্রোহ) ঘোষণা করেছেন। নয়ন পালের গান :

"রাজমহল জঙ্গীপুরে উঠে হূল হূলা
সিদু বলে দাদা কানু—এইবার দেলা।
দেলায়া বাগানাডিহি হয়েছে লগন—"

ইতিমধ্যে সিদু ও কানু রুকনী ও টুকনীকে প্রেমের দাহনে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। দুইভাই দুজনকে গ্রহণ করেন। সিদুর ইচ্ছা ছিল রুকনীকে সাগাই করার। কিন্তু রুকনী এই মুহূর্তে অন্যরকম ভাবে :

"সুভোবাবু দাদা শুন, কহিল রুকনী—
আমি রব চাকরানী সঙ্গের সঙ্গিনী।
পুরুষের বেশ ধরি রব সাথে সাথে—
যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্রে পাতিব বাসর—
গড়িব মনের সুখে অতঃপর ঘর।" (পৃ. ১৬৪)

রুক্‌নী সিপাহীর বেশে, ছদ্মবেশে ব্রিটিশ ফৌজের সন্ধান এনে দিয়েছে সুভো-বাবুকে। এরজন্য, তারা পিয়ালপুরের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তখন তারা সারারাত আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। নয়ন পাল বলেন ; এই নারী ছিল সিদুর শক্তি :

"সাধকের শক্তি যারা তারা নয় বধু।
তারা হয় জীবনের মনোরমা শুধু।" (পৃ. ১৯১)

এরপর সংগ্রামপুরের লড়াই। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে ইংরেজ। এখানে ন্যায় নীতির ধার নেই। এই যুদ্ধে কানু ইংরেজের গুলিতে নিহত হন। সিদুও আহত হন। রুকনী তাকে বনের ঝুপড়িতে লুকিয়ে রাখে। এক সময় দুজনাই ধরা পড়ে। সিদুর ফাঁসি হয়। রুকনী ইংরেজের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এল বটে তবে সম্মুখে তার অনন্ত শূন্যতা। গ্রামের লোকজন তাকে ভাল চোখে দেখল না। কিন্তু সিদুর স্ত্রী ফুল তাকে আশ্রয় দিল। একদিন সে যজ্ঞে আহুতি দিল নিজের জীবন। এইভাবে সে মুক্তি নিল।

তারাশঙ্কর রুকনীকে কাহিনীর নায়িকা গড়েছেন। তার আবেগ, বেদনা, অন্তর্চেতনা চিত্রণ করলেন নিপুণ তুলিতে। রুকনী টুকনীর প্রেম কাহিনী, মানকীর জীবন যন্ত্রণা—এসব কাল্পনিক চরিত্র চিত্রার্পিত হলেও ইংরেজদের অত্যাচার, নারীহরণ ইত্যাদি ইতিহাসে অসংগতি নেই। যদিও কানুর মৃত্যু গুলিতে হয়নি, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই অসংগতি বাদ দিলে, সাঁওতালদের অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও যুদ্ধকাহিনী স্বচ্ছ ও গভীরভাবেই ধরা পড়ে তারাশঙ্করের 'অরণ্যবহ্নি'তে। নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর ঈক্ষণ সম্পূর্ণ সরল। হৃদয়াবেগে কাহিনী উজ্জ্বল হয় বটে আর সাধারণের মনতুষ্টি হয় তাতে।

চার. …জঙ্গলে…

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণায়। প্রথমে তিনি গোড্ডা মহকুমায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন পরে ঐ জেলারই ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন। ফলত, তিনি অনুসন্ধান করে সাঁওতাল যুদ্ধের ইতিহাস জেনেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই উপন্যাস 'জঙ্গলে [১৬]' লিখেছিলেন। তিনি গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমরা যাহাদিগকে "অসভ্যজাতি" বলিয়া থাকি তাহাদের মধ্যেও আমাদের উপস্থিত "সভ্যজাতি"র অনেকের অপেক্ষা মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠে তৃপ্তি লাভ করিলে আমার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।"[১৭]

চম্পাই মাঝি তার পুত্র হারমাকে অনেক বুঝিয়েছেন পাহাড়িয়াদের সঙ্গে বিবাদ না করার জন্য। হারমা সে পরামর্শ শুনতে চায়নি। দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়াদের সঙ্গে তার আপোষ হয় না। পণ্টেণ্ট (পাল্টিন) সাহেবকে তার শত্রু মনে হয় না বটে। তবে দেশে ইংরেজ সরকার বলে যে কিছু আছে তা সে গ্রাহ্য করে না।

শ্যাম পরগণাইত হারমাকে দায়িত্ব দিলেন। পীপড়ায় মাঝির দায়িত্ব। হারমা অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। গ্রামের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তার নজর। কোনোরকম ব্যভিচার তার সহ্য হয় না। ভীষণ মদ খাওয়া তার পছন্দ নয়। এ নিয়ে আমড়াগাছির গর্ভু মাঝির সঙ্গে তার বনিবনা হয় না। সে উল্টো প্রকৃতির লোক।

সময় গড়িয়ে যায়। দিনকালের পরিবর্তন আসে। হারমার কন্যা পুনিয়ার ঝাঁঝি গ্রামে বিয়ে হয়েছে। পুত্র ছোট চম্পাই এখন বড় হয়েছে। শালবনীর মুরুলী মাঝির কন্যা কাঞ্চনীর সঙ্গে তার মন দেওয়া নেওয়া চলছে।

কেনারাম ভগত দেশে হরেক রকম অত্যাচার চালায়। আদালতের পরোয়ানা নিয়ে অনেকেরই সম্পত্তি ক্রোক করে নেয়। মহেশ দারোগা কেনারামের সহায়। পালটিন ও মহেশ দারোগার যোগসূত্র রয়েছে। হারমার নামে মামলা ওঠে। কেনারাম ফরিয়াদি। নাজেহাল হয় হারমা। ধৈর্যেরও শেষ আছে। একসময় "সাঁওতালরা সরকারের সিপাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য স্থির করিলঃ জঙ্গলে তীরন্দাজরা সম্মুখ সমরের জন্য কুড়ালি লইয়া থাকিবে।" (পৃ. ২০৭)

সিদু ও কানু নেতৃত্ব দিল। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে "পাহাড় হইতে প্রবল বেগে তুষারপাতের মত সাঁওতাল সৈন্যদল অগ্রগামী ছোট দলকে সিপাহিদের প্রধান দলকে ছুটাইল—কানু ও সিদু সর্বাগ্রে।" (পৃ. ২২২) কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সিদু ও কানুর দল। ইংরেজ গুলিতে কানু ভূপাতিত হল। সিদু আহত হয়েই ধরা পড়ে। ইংরেজরা তাকেও হত্যা করে। এইভাবে জঙ্গল নায়কদের হত্যা করে ইংরেজরা সাঁওতাল যুদ্ধের অবসান ঘটালো বটে তবে 'জঙ্গল' সাঁওতাল যোদ্ধাদের বীরত্বের পরম সাক্ষী হয়েই থাকে।

সতীশচন্দ্র জঙ্গলের পরিবেশে সাঁওতালদের জীবনচর্যার ছবি এঁকেছেন। সহজ,

সরল করেই এঁকেছেন। বিদ্রোহ ক্ষুব্ধ মানুষদের আভাস দিয়েছেন বটে তবে পূর্ণতর চিত্র আঁকেননি ও ইতিহাস-ও মানেননি। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন, "পুস্তিকা খানির বিষয় ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কিয়দংশ" মাত্র।

পাঁচ. ···সিধুকানুর ডাকে···

সাঁওতাল যুদ্ধের ওপর মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেছেন একটি উপন্যাস—'সিধু কানুর ডাকে' উপন্যাসটি প্রথমে শারদীয়া 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে এটি গ্রন্থিত হয়। উপন্যাসটির আধেয় বা বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। গণযুদ্ধের পটভূমি সবিস্তারে বলা হয়েছে। কেনই বা সাঁওতালদের ক্ষোভ, রোষ উত্তেজনা কেনই বা তারা সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রতিরোধে তীব্র, তীক্ষ্ন। সেসব কাহিনী এখানে সরস-গম্ভীরতায় তুলে ধরেছেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি লেখিকার যে স্বাভাবিক মমত্ব,—তারই উৎসার ঘটেছে এ উপন্যাসে। অবশ্য, সেণ্টিমেণ্টালিটিতে রস কিছুটা ফিকে হয়েছে।

সাঁওতাল গণমনে 'হুল' জেগেছে। অন্যায়, শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধেই তাদের যুদ্ধ। অবশ্য তারা সর্বদা মনে রেখেছে: "আমাদের হুল তো ধর্মের জন্য যুদ্ধ। সন্তালভূমে স্বাধীন সন্তালরাজের জন্য যুদ্ধ।" "যুদ্ধের-ও ধর্ম আছে। ওরা জানে না। যারা লড়তেছে তাদের পায় না তো বুড়া-মেয়ে-শিশু মারে।" (পৃ. ৮৭)

চিঠি লেখা হল জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কেরানিদের কাছে। এতে সাঁওতাল যোদ্ধারা ইংরেজের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করতে চাইলেন যাতে রায়তরা কষ্টে না পড়ে, তাদের ক্ষতি না হয়। সায়েবরা সাঁওতাল সুবার সঙ্গেই যুদ্ধ করুন তাহলে অহেতুক ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে। এমন চিঠি পেয়ে "ইডেন অবাক হয়ে ভেবেছিল, সাঁওতালরা রায়তদের কষ্ট দেবে না, অথচ যুদ্ধ হবে, এমন কথা ভাবছে কি করে? এমন কোন যুদ্ধ আছে যাতে প্রজার ঘর জ্বলে না? ওরা কি 'যুদ্ধ' শব্দটিকে ধর্মীয় শুভ্রতা আনতে চাইছে? ওরা কি, কি ওরা?" (পৃ. ৮৯)। এমনই সভ্য-অসভ্যের দ্বন্দ্ব ঝুলিয়ে রাখলেন লেখিকা। এই যে দোলাচল ইংরেজ কর্তা-ব্যক্তিদের মনে, তারই এক বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সিদু প্রত্যয়দীপ্তভাবে বলেছেন: "হুল করছি, তা চালাব। রাজ পাব কিনা জানি না। কিন্তুক যতদিন না সন্তাল লোক সুবিচার পায়, সে হুল করবে।" (পৃ. ১০০), তারা এমন এক রাজ্য গড়ে তুলবে যেখানে তাদের 'কামিয়া' থাকতে হবে না, 'কজ" নিতে হবে না। 'উকিল মোক্তার মহাজন' নেই। 'বড় জাতের জুতো' খেতে হবে না। কাজ করে 'শান্তিতে' থাকা যাবে। 'পেটে ভাত, পরণে কাপড়' নিশ্চন্তে মিলবে। 'নীলকুঠি' 'গোরা', 'থানা-পুলিশ' থাকবে না। 'খাজনা' দিতে হবে না। (পৃ. ১০১) তাদের অন্তরতম সুখ অন্বেষণ

এমনই ; "সন্তালরে সন্তালের মত থাকতে দাও।" এই চাওয়া তো তাদের জীবন-পরিণামে অতিস্বাভাবিক,—অতিপ্রশ্নাতীত, সাবলীল।

উপন্যাসের তথ্যে দুই একটি অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সিদু কানুর পিতার নাম চুনার মুর্মু বলা হয়েছে। কিন্তু কানু ধরা পড়ার যে বিবৃতি দেন[১৮] তাতে বলেছেন যে, তাঁরা নারায়ণ মাঝির পুত্র। আবার, সরকারের তরফ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয় তাতে অভিযুক্তদের নাম কানুমাঝি, চাঁদসুবা ও ভৈরব সুবার নাম জানা যায় এবং পিতার নাম নারায়ণ মাঝি উল্লেখ আছে।[১৯] অনেক গ্রন্থে-ই চুনারমুর্মু নামটি মেলে। যদিও সরকারি নথিতে নারায়ণ মাঝি নাম পাই এবং এটি তাঁর পুত্ররা স্বীকার করেছেন তা মেনে নেওয়াই ঠিক। তবে নারায়ণ মাঝির আর এক নাম-পরিচয় চুনার হলেও হতে পারে। তাছাড়া, উপন্যাসে বলা হয়েছে ; সামরিক অফিসার গোডেলের সঙ্গে ভাগলপুরের কাছাকাছি এক যুদ্ধে চাঁদ-ভৈরব নিহত হন। তথ্যটি ঠিক নয়। এক্ষেত্রে-ও আমরা সরকারি নথির ওপর নির্ভর করব।[২০] এতে বলা হয়েছে। বিদ্রোহী নেতা হিসাবে এঁরা অপ্রধান নন। তবে অপেক্ষাকৃত বয়সে ছোট, শোণিত-ক্রিয়ায় কম সক্রিয় ও অনভিজ্ঞ। তাই বিচারে এঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। উল্লেখ্য, আমাদের প্রাগুক্ত নথিতে লক্ষ্য করা যাবে যে কানুর সঙ্গে তাঁরা অভিযুক্ত এবং দণ্ডের অপেক্ষায়। সুতরাং তাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হননি।

ছয়. ...ভগনাডিহির সেঙ্গেল...

সিদু ও কানুর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী গণসংগ্রামের ওপর সম্প্রতি একটিউপন্যাস,—"ভগনাডিহির সেঙ্গেল"[২১] প্রকাশিত হয়েছে। লেখক তপন বসু। আরণ্য-অধিবাসীদের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পেষণ, দেশীয় জমিদার, মহাজন ও কারবারীদের শোষণ অত্যাচারে পিষ্ট সাঁওতালরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল; একসময় সে প্রতিবাদ এমনস্তরে পৌঁছুল যে, 'জুলুমশাহী সরকার'কে সামরিক বাহিনীনামাতে হয়, যুদ্ধ-ই ছিল অন্তিম-লক্ষ্য।

সাঁওতালরা সরল প্রাণের মানুষ। কাজের আহ্বানে তারা ছুটত। অথচ এই কাজে-ও তাদের অভাব যেত না। খেত-খামারে, তিন পাহাড়, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুরের রেল-সড়কে কিংবা মহাজনী গোলায় তারা দাসত্ব করেছে। আবার অভাবের তাড়নায় যদি তারা একবার মহাজনী ঋণ নিত, তার শেষ হত না কখনই। এরা তাদের ভাতে মেরেছে, প্রাণে মেরেছে। এর ওপর সাহেব, অসাহেবদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল এদের ঘরের মহিলাদের ওপর। বঞ্চনা, বিনষ্টির বিরুদ্ধে প্রায় শত বছর পূর্বে তিলকা মুর্মু প্রতিবাদের ঝড় তুলে শহিদ হয়েছিলেন। তাঁরই উত্তরসূরী হিসাবে "হুলের লেগে জাহানু কবুল" করেছেন সিদো, কানহু। তাঁরা ডাক দিয়েছেন : "দেলায়ে বিরিদ পে, দেলায়ে তিঙ্গুন পে—জাগো ওঠো, সাঁওতাল রাজ কায়েম করো।" (পৃ. ১০)

তাঁরা সেনাদল তৈরি করেন। যুদ্ধ আসন্ন। সেভাবেই প্রস্তুতি চলে। মকরু টুডু একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। আশায় বুক বাঁধে। সে কথা গোপনে স্ত্রী শলমাকে জানাল : "মোদের লেতা, সানথালদের লেতা, সিদো-কানহুর লুতুরে লুতুরে (কানে কানে) ভগওয়ান হুকুম করাছে, "সানথাল রাজ বানা করাও"। মোরা সাহেবদের, তাবাদে দিকুদের হটাইন দুব্ব। তোর লেগে সানথালদের বহুদের লেগে জমি মিলা করাবে। জমিনদারটোর খাজনা মিলব্যাক নাই। মহাজনটোকে ধান, গেঁহু, মকাই বিকাইব নাই। নীলের খেতিতে বেগার দিতে হব্যাক নাই।" (পৃ. ১৩) সাঁওতালরা এতই নিপীড়িত, নির্যাতিত যে, তাদের অন্তর্জ্বালা এমনই—"দেওতা থাকে কত্ত দূরেগো? কত উঁচাতে? মোদের কি নাগাল মিলব্যাক নাই? মোদের অনেক কষ্ট যে গো।" (পৃ. ২২)

সিদো, কানহু, চাঁদ ও ভৈরব চার ভাই যুদ্ধের ডাক দেয়। অন্যায়ের শাস্তি বিধানে উদ্যত। তাই মহেশ দারোগা নিহত হয়। জমিদার ও মহাজনদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। শুরু হয় প্রতিবাদের মিছিল, তীরের ফলায় বিষ। পাঠানো হল শাল 'গিরা'। কোম্পানির কর্তাদের টনক নড়ে। সামাল সামাল রব। রণকুশলী সেনানীদের ডাক পড়ে। ফৌজ এল। পিয়ালাপুর যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হলেন বারোজ। ছোটলাটের হুকুম : "যেভাবেই হোক, সাঁজোয়া গাড়ীর বেল্টের নীচে ফেলে পিয়ালাপুরের ল্যাটারাইট মাটি আর সাঁওতাল গাঁগুলো গুঁড়িয়ে সুরকির মত করে দিতে হবে।" (পৃ. ৭৯) বলাবাহুল্য, ইংরেজবাহিনী এরকম হুকুম যথার্থই পালন করেছিল। তবু-ও হুলের আগুন এমনই ছিল যে পিয়ালাপুর যুদ্ধে সাহেবদের পরাজয় মানতে হয়। যুদ্ধ জয়ের আনন্দে সাঁওতাল সৈনিকরা আত্মহারা হয়ে গাইল ;—

"হুল…হুল…হুল ॥
দেলা দোমেল দোমেল।
দেলা লগন লগন ॥
দেলায়ে বিরিদ পে,
দেলায়ে তিঙ্গুন পে।"
"সানথাল রাজ বানা করাও।" (পৃ. ৮২)

কিন্তু বিডওয়েল সাহেব ভাগলপুরের কমিশনার হয়ে আসার পর পরই ফৌজি হাঙ্গামা নতুন মোড় নেয়। তাই সাঁওতালবাহিনী সতর্ক বটে আবার ভীত-সন্ত্রস্তও বটে। তবে পিয়ালাপুরের হার সাহেবরা ভুলতে পারেনি। তার জবাব সংগ্রামপুরের যুদ্ধে দেবার জন্য ছিল রেঞ্জার্সবাহিনীকে সাজান হল। তৈরি সাঁওতাল সৈন্যরাও। নেতাদের হুকুম "হয় সানথাল রাজ বানা করাও, আর নয়ত জাহুন দাও।" (পৃ. ১১৯) কিন্তু কামান আর গোলাবারুদের বিপক্ষে তীরধনুক, তরোয়াল, বন্দুকের অসম লড়াইয়ে সাঁওতালদের পরাজয় হল। এই যুদ্ধে চাঁদ

নিহত হয়। সিদো ও কানহু তখনও বেঁচে। তাই ব্রিটিশ শাসকদের ঘুম নেই। ১৮৫৫ সালের ১০ই নভেম্বর সামরিক আইন চালু হল। তাতে লাভ হল না কিছুই। ১৮৫৬ সালের ৩রা জানুয়ারি সামরিক আইন উঠে গেল। ভাগলপুরের যুদ্ধে আবার ইংরেজ সরকারকে ফৌজ সাজাতে হল। এতেই ১১ই ফেব্রুয়ারি কানহু নিহত হন এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিদো।

ইতিহাসের তথ্য আছে। যাচাই নেই। ইংরেজ সেনানীদের নাম, গ্রামনাম কিছু মেলে, কিছু মেলে না। শোষণ পীড়ন চিত্রের অসঙ্গতি নেই। অসঙ্গতি আছে সন-তারিখের। সাঁওতাল নায়কদের নিধন চিত্র ইতিহাসেরই অসঙ্গতি। এই প্রসঙ্গে আমাদের ইতিহাস পর্বে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ধার দিয়ে গেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেননি। তিনি ছোট ছোট কথা চিত্র এঁকেছেন। মুন্সিয়ানা আছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের জেহাদ ঘোষণা আর আজাদীর জন্য লড়াই—এ নিয়ে কথাবস্তু। 'তাবাদে' শব্দটি একটি দুষ্ট মুদ্রা। মহাজন ভগতের ওজনে ঠকানোর বে-নিয়মি মাপের বিরুদ্ধে যখন চুনার মাঝি বলেন ;— "বিশ বোল বাবু বিশ বোল, একবার ত বিশ বোল।" কথার ঝঙ্কারে, শ্রুতি মাধুর্যে, গণসঙ্গীত হয়ে ওঠে জেহাদী-উপন্যাস 'ভগনাডিহির সেঙ্গেল'-এ ॥

সাত. …অগ্নিপর্ণী শাল পিয়াল…

সাঁওতালদের গণ অসন্তোষ ও যুদ্ধের পটভূমিকার ওপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য * রচনা করেছেন একটি উপন্যাস 'অগ্নিপর্ণী শাল পিয়াল'। ২১ক. ঔপন্যাসিক অধ্যায় ভাগের কথা বলেননি বটে, তবে পঁচিশটি ছোট ছোট পরিচ্ছেদের মতই পর্ব সাজিয়েছেন।

"আতো ভাগনাডিহি।

দামিন-ঈ-কোহ পার্বত্য সানুদেশে প্রকৃতির শ্যামলা অঞ্চল, সাঁওতাল গ্রাম ভাগনাডিহি।" এই ভাগনাডিহির কথাচিত্র এঁকেছেন। গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক ঘর-কন্না, সুখ-দুঃখ, আহার-বিহার, মৈথুন, প্রেম-বিরহ নিপুণ তুলিতে চিত্রিত করেছেন। সিধু, কানহু, ভৈরব ও চান্দোর সহর্ষ জীবন, তাদের শিকার ও উৎসব, ভাগনাডিহি হাটের সরগরম প্রভৃতি চলমান জীবনের কিছু ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। অপরদিকে, তাদের ক্ষোভ, রোষ সংগ্রামমুখর জীবন ; সর্বোপরি লড়াই জীবন-মরণ এসব কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে উপন্যাসে। কল্পনাও আছে। তবে সে মিশ্রণ বাস্তবের ধার ঘেঁষেই হয়েছে। যে সত্য তিনি অনুভব করেছেন তারই ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর অনুভূতির নিবিড়তা থেকে উৎসারিত শব্দগুচ্ছ এমনই :

---

* চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য লেখকের ছদ্মনাম। আসল নাম সুভাষচন্দ্র ঘোষ।

'আতো ভাগনাডিহি মানে হড়ের পৃথিবী ;
'হড়্ মানে তো সরলতার ঘর !'
'হড়্ মানে ঘন সন্নিবিষ্ট মানবতার দুর্ভেদ্য গড়',
'হড়ের আতো যেন বিশ্বস্ত স্নিগ্ধতার আকর ;
'হড়্ মানে স্বাধীনতায় অক্ষয় গড়' ।

ভোগনটুডুর কুটির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে জনাপঁচিশ হড়্। তারমধ্যে নারীও আছে, বারো তেরটি। পুরোহিত সুরীন মুর্মু শুরু করেন উপকথা, অতীত দিনের কথা। তাঁর বলার মধ্যে অসন্তোষের বীজ। তিনি বলেন, "সে অনেক অনেক বছর আগের কথা—আড্ডী আড্ডী সেরমা। এতবছর যে হাত আর পায়ের আঙুল গুণে শেষ করা যায় না। পাজী দীকু মহাজনরাও সে হিসেব জানে না। তাদের খেরো বাঁধানো পাকা বহি কিতাবে এ আঁক লেখা অসম্ভব। একটা মানুষের দেহের সব হাড়গোড়, হড়ের হড়মোর যত হড়মহাটিং তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বছর।" (পৃ. ১) তিনি শোষণের সূত্র ধরেন। কাহিনীর উৎসার এখান থেকেই।

লেখক ইতিহাসের গভীরে তাঁর অন্বেষণ। হাজারীবাগ জেলার হড়রাজ্য ছৈ আর চম্পা ছেড়ে আসতে তারা বাধ্য হয়েছে মুসলমান বাদশা ইব্রাহিম আলির দৌরাত্ম্যে। সেসব তেরশ চল্লিশ খ্রীস্টাব্দের কথা। চতুর্দশ শতাব্দীতে হড় বাহিনীর দামিন অঞ্চলে প্রবেশ। তারা সেখানে প্রবেশ করে পাঁচ হাজার বর্গমাইল অরণ্যের মধ্যে দেড় হাজার বর্গমাইলে তাদের আত্মবিস্তার। আদি পাহাড়ীর সংখ্যা ছিল বটে তবে তা নগণ্য। ১৮৩৫-৫১ মধ্যে পাঁচশত আতো, আবাসিক হড়ের বিস্তার। "অবশ্য দীকু ও মোগল রূপী কাটাগুল্মও এই অবসরে আত্মপ্রকাশ করেছে।" (পৃ. ৫০)

"হড়ের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সৃষ্ট শস্যসম্পদপূর্ণ শ্যামলী বসুন্ধরা, গো-সম্পদ আর মহানশিল্পী অংকিত চিত্রপটের মতো সুন্দর ওড়াগুলি। পূর্ণিমা নিশীথে সেখানে সুরের লহরী, নৃত্যের সজীবতা, জীবনের অনাবিল কোলাহল। এদিকে এসে পড়লে মিস্টার পণ্টেট এখানে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর পরিক্রমা ব্যস্ত ঘোড়াটি-ও যেন অভ্যস্ত নিয়মে এখানে বিশ্রামের অনুসন্ধান করে।" (পৃ. ৫০) এই পণ্টেট দামিন-ঈ কো'র পর্যবেক্ষক শুধু নন তাদের বন্ধুস্থানীয় 'পুঁটিয়া সাহেব'। তিনি এদের কাছে শিকারের দ্রব্যাদি কেনেন। সাপের চামড়া কিনলে পাঁচটি শাদা পয়সা দেন আবার সাহেবি-চুরুটও উপহার দেন। ভাগনাডিহি থেকে দামিনে গেলে হড়ের কাছ থেকে শুধু জিনিসই কেনেন না, দারু ও দাকা খাইয়ে আপ্যায়ন জানান। তাঁর সঙ্গে হড়ের কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ দামিনের চারজন সাজাওয়ালা, মহাজন, ও পাহাড়ীদের সঙ্গে। পুঁটিয়া ব্যতীত "হড়ের বংশানুক্রমিক স্মৃতিতে শাদা বেড়ালের (সাহেব) যে পরিচয় লেখা আছে তা কখনো ভুলে যাওয়ার মতো নয়। পোড়া ঘায়ের দাগ কোনোদিন মেটে না।" (পৃ. ৫৭) তাই তিলকা মাঝির হত্যার

কথা তারা কোনোদিন ভুলতে পারে না। তাই ইংরেজ সাহেব দেখলেই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

মাঝিস্থানে আয়ু পবেরর হুল্লোড়ের মধ্যে সংবাদ মেলে দীঘলটুডুর দাদা গড়ম মহাজনের কবলে পড়েছে। মহাজনের কাছে সুদের মেয়াদ চাইতে গিয়ে সে ফেরেনি। "এর আগের বার ফসলের সময় মহাজন ভয় দেখিয়েছিল তিনমাসের মধ্যে সুদ শোধ না হলে দারোগাকে দিয়ে বাঁধিয়ে কাজির কাছে চালান করে দেবে।" (পৃ. ৮৪) কানহু ভাবলো, "মহাজন না কসাই, দারোগা না যমদূত, কাজী না পাজী! এরা তিনে মিলে চিরদিন ষড় করে হড়ের সর্বনাশ সাধনে ব্যস্ত।...এদের মূলসমেত উপড়ে ফেলতে না পারলে হড়ের মুক্তি নেই।...মোটের ওপর ব্যাপারটা এখন গোলমেলে। একদিকে হড় একা, আর অপরদিকে বাকি সবাই, দীকু মহাজন, মোগল দারোগা, মিঞাকাজি, মালের এবং মালপাহাড়ী, নীলকুঠির সাহেবও তাদের জাতভাই পোণ্ড রাপাজ। এদের সবাইকে একসঙ্গে শেষ করা দরকার, তবেই হড়ের সুখ আর শান্তি।" (পৃ. ৮৪)

ফলত শুরু হয় জোট বাঁধা, জেহাদ আর প্রতিশোধের পালা। শুরু হয় পাহাড়ী-দের সঙ্গে বিবাদ। এর ফলে যে তিনজন হড় নিহত হয় তার মধ্যে ভোগন টুডু একজন। সিধু ভ্রাতৃবর্গ এনিয়ে উত্তাপ সঞ্চার করে। প্রশাসনের চমক লাগে। পণ্টেট রিপোর্ট দিলেন। কিন্তু কমিশনার বিডওয়েল সাহেব হড়ের বিপক্ষেই নির্দেশ দিয়েছেন, সতর্ক হতে বলেছেন। অন্যচিত্র, মহাজন ভগত সুদ গোনে, হড়ের ফসল ঘরে তোলে; ওজনে ঠকায়। পোষালী ধান তৌল গণনা করে ভগতের কণ্ঠধারী গোমস্তা; সুর করে গীত গায় "রামে রাম, রামে রাম, রামে রাম।" (পৃ. ১২৭)

হড় প্রতিবাদ করে "এ কিরে ভগত, তোর গুমস্তো কতবার রামে রাম করবে; এবার রামে দুই করতে বল?" রামের মহিমা শুনিয়ে ভগত বলে "হ্যাঁ রঘুরাজ, এবার রামে দুই কর, রামে দুই।" (পৃ. ১২৮)

দীঘল সিধু ও কানহুর দলে যুক্ত হয়েছে। সে তাদের কাছে শুনেছে হড়ের ভাল দিন আসছে, দামিন-ঈ-কো জুড়ে আবার তারা আধিপত্য করবে, দীকু ও মোগল নির্মূল হবে। পাহাড়ী ও দেশী সেপাইদের আর সেইসঙ্গে সাহেবদের তাড়ানো হবে। অবিচার অত্যাচার প্রাবল্যে জর্জরিত পরাধীন হড় রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাই, সিধু কানহুর বাণী নিয়ে যে চারজন হড় অম্বরে গিয়েছিল দীঘল তাদেরি একজন। দীঘল বলেছিল, "সিধু কানহুই নাকি হড় সমাজের নতুন রাপাজ। মারাং বুরু তাদের সমাজ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজা করে ধারীতিতে পাঠিয়েছে।" (পৃ. ১৪৮)

'হড় সমাজের কাছে আজ আতো ভাগনাডিহি অসীম আকাশের বুকে নির্দিষ্ট দিক্‌চিহ্ন ধ্রুব তারার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।' সেখানে দশ হাজারের অধিক হড় যুদ্ধ

সাজে উপস্থিত। মাঝিস্থানের বেদীতে সিধুরা চার ভাই, দীঘল ও আর ক'জন নেতৃস্থানীয় হড়। সিধু ঈশ্বর দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। ঠাকুর জিউর আবির্ভাব প্রসঙ্গ তুলে ধরে। ঠাকুর অজস্র কাগজপত্র ও কিতাব দিয়ে গেছেন। এতে জমিদার মহাজনদের সঙ্গে আচরণ বিধি, ঋণের কথা উল্লেখ আছে। "দারোগা… সাজাওয়াল, পাহাড়ী ফৌজ আর শাদা কুকুরদের সম্পর্কেও কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তার-ও নির্দেশনামা এই কিতোব।" (পৃ. ১৬০)

আবার আমড়াপাড়ার হাটে খ্রীশ্চান পাদ্রীর কাছ থেকে সংগৃহীত সেন্ট জনস্ গসপেলখানি কানহু হড় ভাষায় পড়ে শোনাল : "সব দীকু মহাজন আর জমিদার-দের মেরে কেটে শেষ করে ফেলতে হবে।…হড় রাজ্যের যত দারোগা আর সাজা-ওয়ালকে কেটে ফেলতে হবে। পাহাড়ী ফৌজ দেখলেই দূর থেকে তুপুঞ্জ করবে—তীর বিঁধে মারতে হবে তাদের। (পৃ. ১৬০) কানহু আরও জানাল যে কমিশনার সাহেবকে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে এই মর্মে ; বিদেশী কুকুরের সঙ্গে তাদের ঝগড়া নেই। তবে মোষের লাঙলের ওপর বছরে দুআনা এবং বলদের লাঙলের ওপর বছরে একআনা আর মহাজনের সুদ বছরে টাকায় এক পয়সা করে দেওয়া হবে। কিন্তু দীকু মহাজন আর মোগল দারোগাদের পুড়িয়ে খুন করা হবে। এ বিষয়ে অনুমতি দিতে হবে, কিন্তু আজও অনুমতি আসেনি।

সুতরাং বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কেবল দামিন-ঈ-কো-তে নয়, পশ্চিমে কাহাল-গাঁও থেকে পূর্বে রাজমহল এবং উত্তরে রাণীগঞ্জ থেকে দক্ষিণে সাঁইথিয়া। সিধু বলে, পাজী দীকু আর পোন্ড সেতারা আমাদের 'সুতাঁর বলে', আজ থেকে তাদের কানে পোঁছে দিতে হবে ; 'আমরা হুল সাঁতার—বিদ্রোহী সাঁতার।' তারা 'জয়বাবা তিলকা মাঝি' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রক্তক্ষরা, অগ্নিঝরা একুশটি দিন পার হয়। ঘটনা অনেক ঘটে। পাঁচ খুঁটিয়ায় দারোগা হত্যা, দীকু ও পাহাড়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ, বোরিও বাজারে প্রথম যুদ্ধের মহড়া, দীঘলের হাতে হরেরাম ভগতের খুন, হড় সুবাহ্ সিধু রাপাজের শারজাম পাতড়া সদর্পে প্রচারিত হল। রাজমহল তিনদিনের মধ্যে আক্রমণ করা হবে ; এমন প্রচারে প্রাণভয়ে শহরবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গতুল্য সঙ্গিদালানে হাজির হয়। খবর পেয়ে রাজমহল ও ভাগলপুরের কালেকক্টর লসিংটন সাহেব সহস্র সৈন্য নিয়ে দুর্গ প্রহরার ব্যবস্থা করেন। এডেন সাহেবও এসেছেন। অন্যদিকে, "হুল হড়ের আক্রমণ সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে মীনপ্রবাহের মতো। বিপুল সংখ্যাধিক্যই তার মূল এবং মৌলিক বল।" (পৃ. ১৮৩) ফলে যুদ্ধ দামামা বেজে ওঠে। সঙ্গি-দালান সহজেই হড়দের হস্তগত হয়। কিন্তু এডেন সাহেব প্রাসাদের আশ্রিতজনের রক্ষায় সদা তৎপর হন। পুঁটিয়া সাহেব সুকৌশলে বলেন ; দীকুদের শাস্তি তোদের দিতে হবে না, আমরাই দেব। একদা নেতাদের খুনের দায়ে নিশ্চিত ফাটক, ফাঁসি থেকে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন বলেই এই মুহূর্তে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' ঋণ পরিশোধ

চাইলেন। সরল হড়েরা তাদের আপত্তি করেনি, পেছনে ফেরে। এই অংশটি কাহিনীর শিথিল বন্ধন।

শুধু সঙ্গিদালানের যুদ্ধ নয়, সিধুর অম্বর বিজয়, সিউড়ি দখল প্রভৃতি হড়ের মনে প্রেরণা যোগায়। তৈরি হয় বীরগাথা, 'সিদো-কানহু সেরিং'। জয়ের আনন্দে তারা আপ্লুত ছিল বটে তবে তা ক্ষণিক। ইংরেজ ফৌজ হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। মুর্শিদাবাদের কালেক্টর টুগুড সাহেব ফৌজ নিয়ে হাজির হন। যুদ্ধ দামামা বেজে ওঠে। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ নিয়ত অগ্রপশ্চাৎ। এভাবে কাটে দুটো দিন। ক্রমে ক্রমে অম্বর, রাজমহল, তিনপাহাড়, গোড্ডা ও দুমকা সবই তাদের হাতছাড়া হয় হুল হড়ের। কোটালপুকুরের যুদ্ধে সিধু আহত হয় ও ধরা পড়ে, কোম্পানি তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। রাজকীয় মর্যাদা সে পায়নি। সিধুর লাশ কুকুর শকুনকে উপহার দেওয়া হয়।

পরপর পরাজয়ে হুল হড়েরা আত্মবিশ্বাস হারায়, অন্তর্কলহ দেখা দেয়। কানহু বর্ষার মুখে যুদ্ধ থামিয়ে আত্মগোপন করার নির্দেশ দিয়েছিল; হুলহড়েরা শুনল না। জঙ্গলে আশ্রয় নিল বটে। দীর্ঘ পাঁচদিন খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে তাদের অবস্থা শোচনীয়। এর ওপর, টুগুড জঙ্গলের এক মুখ খোলা রেখে তিন দিকেই আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে অগ্নিবলয়ে আকস্মিক অগ্নিদাহে মৃত্যুর পূর্ব-সমর্পিত কিছু প্রেতমূর্তি বেরিয়ে এসেছিল বটে। তবে যারা থেকে গেল, নিছক যুদ্ধের মহড়া হিসবে উদ্দেশ্যহীন নিশানার ফলে একসময় তীরের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেল "অর্থাৎ সব দিক থেকে অবধারিত মৃত্যুর পদক্ষেপ", (পৃ. ২০৫) শোনা গেল।

উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তার এ পর্যন্তই। কথাচিত্রের মধ্যে তিনি আন্তরিক হবার চেষ্টা করেছেন। সরল বিবৃতি, ভাষায় নির্বাধ অকুণ্ঠতা। তবে ইতিহাসের অন্বেষণ আছে, মগ্ন-চেতন নন, যুদ্ধ সম্পর্কে আভাসচিত্রে ভিন্নতা রয়েছে। দুই পক্ষের যুদ্ধচিত্রের বিস্তৃত তথ্য অনুক্ত। পন্টেট সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে ঢের। এতটা তাঁর প্রাপ্য নয়। ঔপন্যাসিকের বলার ভঙ্গিটি সরস, চিত্রকুশল, অমধুর লাগে না।

॥ দুই ॥

সাঁওতাল যুদ্ধের ওপর আরেকটি উপন্যাস 'দামিন-ই-কো'র ইতিকথা' প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'অনীক'-এ।[২২] লেখক স্বর্ণমিত্র সাঁওতালদের বেদনার চিত্র মোটা রঙ দিয়ে এঁকেছেন। যথেষ্ট ভাবাবেগ আছে, বাগ্‌বাহুল্য নেই। তিনি বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতার সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রচণ্ড উজ্জ্বল একটি নাম: সাঁওতাল বিদ্রোহ। প্রায় পঞ্চাশ হাজার তীর-ধনুক-টাঙ্গি-তরোয়াল মাত্র সম্বল কোরে এবং সকল সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর কোরে সশস্ত্র বিদ্রোহের যে রক্তরাঙা পথ রচনা কোরে দিয়ে গেছে, সেই পথই ভারতীয়

জনতার মুক্তির পথ। আর সে কারণেই কোটি কোটি ভারতীয় জনতার মনে আজও সাঁওতাল বিদ্রোহ এতো উজ্জ্বল, এতো মহান। "দামিন-ই-কো'র ইতিকথা" সেই অগ্নিঝরা লড়াইয়ের দিনগুলিরই উপন্যাস রূপ।"

এটি ঠিক উপন্যাস হয়নি। বিন্যাস উন্নত নয়। ইতিহাসের তথ্য কাহিনী মাত্র। ভাবের আতিশয্য আছে ঠাট বা পোজ উগ্র নয়। তাই উপভোগ্যতা সেখানেই।

২.

সাঁওতালদের গণসংগ্রামের সূত্র মনে রেখেই সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী রচনা করেছেন উপন্যাস—'অরণ্য কন্যা'।[২৩] তিনি মনে করেন, সাঁওতালদের বাস্তব জীবনে উন্নতি হয়নি এখনও, অপ্রাপ্য থেকে গেছে অনেক কিছু। তাই পিয়ারী তাঁর উপন্যাসের নায়িকা, নেত্রী। তার মুখ থেকে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

৩.

এ ছাড়া, ইংরেজিতে একটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। কার স্টেয়ার্সে'র লেখা 'Harma's Village'।[২৪] পথুরিয়া—বেনাগারিয়ার 'সন্তাল মিশন অব দ্য নর্দান চার্চে'স' এর প্রকাশক। কথোপকথন ভঙ্গিতে লেখা, বিদ্রোহের বিবরণ। যুগিয়া বুড়ো ও ছোটুরে দেশ মাঝির সাঁওতালী ভাষার কথনলিপি নাটকীয় ভঙ্গিতে সাজান হয়েছে। এতে দেশ মাঝিদের দ্বারা বিদ্রোহকে অন্যায় ঘোষিত করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের সুযোগ সন্ধানী বলা হয়েছে। সুবাদের নিন্দা ও সাহেবদের গুণগান করা হয়েছে।

বস্তুতঃ একটি নীতিবাদ প্রচার করা হয়েছে। এসব মিশনারিদের কৌশলমাত্র। আবার কৌশল এমনই পাঁচপাঁচি মানুষের প্রতি নিষেধের অঙ্গুলি সংকেত যাকে বলে।

তৃতীয় পর্ব ॥

সাঁওতাল গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া—গল্পে

...অরণ্য প্রহরী...

সাঁওতাল যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে একটি গল্প লিখেছেন সুধীর করণ। গল্পটির নাম 'অরণ্য প্রহরী' *। গল্পটি ঐতিহাসিক। গল্প বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের খুঁট ধরেই চলেছেন। সরস তাঁর বর্ণনা। দীপ্ত আবেগ আছে তবে সংযত প্রকাশ। কাহিনী সরল। বর্ণনা এরূপ ;—'শারজম্-দারে'—শাল বৃক্ষের ডাক পড়েছে। শালপত্র হাতে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে যায় বিদ্রোহীরা।

গোটা জাতিকে মিলিত করার ডাক, সম্মিলিত করার ডাক। তাই পাহাড়ী নদীর দুধার স্রোতের মতো অরণ্য মানুষ, বন বাদাড় ডিঙ্গিয়ে, পাহাড়-প্রান্তর পেরিয়ে ভগ্‌নাডিহি গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে। নাগড়া, কাশী বাজছে। সবারই লক্ষ্য ভগ্‌নাডিহি। সিদু কানু ও ভৈরব 'ঠাকুরবাবার' নামে ডাক দিয়েছে গোটাসাঁওতাল জাতিকে। স্বয়ং ঠাকুর ভগ্‌নাডিহিতে হাজির।

জাহের থানে বেদী তৈরি হয়েছে। বেদীর ওপর একটা গোলাকার বস্তুকে সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। বেদীর ডান পাশে বসেছে সিদু কানু চাঁদ ও ভৈরব। বাঁ-দিকে বসেছে বিভিন্ন গ্রামের মাঝি-মোড়ল। সাঁওতাল 'কোড়া'-রা জোয়ানরা তীর ধনুক কুড়ুল-টাঙ্গি আর তাদের বিশ্বস্ত অনুচর দেশী কুকুর নিয়ে হাজির। সিদু সবাইকে লক্ষ্য করে ঠাকুরের নামে দাঁড়িয়ে বলল : সাঁওতাল জাতির 'আদি পুরুষ ছিল পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ী'। সাঁওতাল মাতব্বররা মাথা নেড়ে সায় দেয় : হোয়্ হোয়্।'

আমরা খেড়ওয়াল জাতির হড়-হপন (সন্তান) আদিকালের লোক।' ধ্বনি ওঠে : 'হোয়্ হোয়্'।

শুরু হয় কথার বিনুনি।' 'হিহিড়ি পিপিড়ি থেকে আমাদের জাতভাইরা চাঁই চম্পাতে চলে আসে।' এরপর সিদু ঠাকুরের কথা শোনায়। তারা দু'ভাই কিভাবে ঠাকুরের দেখা পেয়েছে, সে সব অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করে। ঠাকুর যে 'ধরম-পুঁথি' দিয়ে গেছেন, সে কথাও তারা বলে। দেবীর ওপর স্থাপিত গোলাকার বস্তুর ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলে বলল ; এই আমাদের 'চক্রদেবতা'। 'জোহার'! প্রণাম করলো সবাই।

সিদু গম্ভীরভাবে ঠাকুরের আদেশ জারি করলো। 'দিকু হ'ড়ার সুদখোর মহাজনদের মেরে ফেল ; এক বছরে টাকা প্রতি এক পয়সা সুদ দাও ; খাজনা আদায় করবে—সাঁওতাল রাজা। সরকারের কাছে খাজনা পাঠাবে সাঁওতাল রাজা,—গরু লাঙলে এক আনা, মহিষ লাঙলে দু আনা…।' আরও কিছু ঘোষণা ছিল ; 'দিকুরা আমাদের [illegible]ন চুষে খাচ্ছে, জমি জায়গা ডাংরা মেরম্—কাড়া-ভেড়া (গরু ছাগল-মোষ-ভেড়া) [illegible]ড়ে নিচ্ছে, দারোগা পুলিস-ইংরাজ রাজা ওদের গৃহে গলা টিপবে আমাদের,চাবুক মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিচ্ছে, বাহিনু বিটিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। টাকা শোধ করতে না পারলে সারা জীবনের মত কামিয়া করে রাখছে। চাকর করে রাখছে।' যুদ্ধের নামে সিদু অভয় দিয়ে বলল : ঠাকুর বাবা বলেছেন, কেউ যেন ভয় না পায়। 'সাঁওতালদের কাঁড়ের সামনে-তীরের সামনে ইংরাজের বন্দুকের গুলী জল হয়ে যাবে।'

বনের প্রশান্তির মধ্যে দাবানল সংগুপ্ত থাকে। তাই সিদু কানু চাঁদ ও ভৈরব বুঝেছিল সাঁওতাল জাতিকে বিলুপ্তির পথ থেকে টেনে তুলতে হলে স্বাধীন আরণ্যক চেতনাকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই আগুন জ্বালাবার পরামর্শ করলো

ভগনাডিহির চারজন। আগুন আত্মপর চেনে না'। সে কথা ওরা জানতো। তবুও ভয় নেই। কারণ, মহাজন, শোষক, ইংরেজ তাদের সর্বনাশ করছে। হৃদয়হীন মহাজনও সুদখোরের প্রতি বদলা শুরু হয়। তাদের বাঁচাতে মহেশ দারোগা তৎপর হয়। দামিন-ই-কোহ জ্বলে ওঠে। পাঁচকুঠিয়া বাজারে মহেশ দারোগাকে তারা টাঙ্গি দিয়ে হত্যা করায় গণবিদ্রোহের প্রথম পর্যায়টি রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। এদিনই, বাজারের পাঁচজন মহাজনকে হত্যা করা হয়। এরপর গ্রামের পর গ্রাম তাদের দখলে আসে। পলসা ভস্মীভূত হলো। সিউড়ী আক্রমণ করার জন্য সাঁওতাল বাহিনী এগিয়ে যায়।

সাঁওতাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে ইংরেজের সেভেনথ্ নেটিভ ইনফ্যানট্রি নামে। মহেশপুরে মুখোমুখি সংগ্রাম হলো। ইংরেজদের সহযোগিতার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব ত্রিশটি হাতি পাঠালেন, নীলকুঠি সাহেবরা টাকাকড়ি, রসদ সবই দিল। ১৮৫৫ সালের ১৫-ই জুলাইয়ে মহেশপুর যুদ্ধে ২০০ সাঁওতাল প্রাণ দিল। ব্রিটিশ শক্তি শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল রাজধানী বারহাইত আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করল। সবচেয়ে বড় ঘটনা, ভাগলপুরের সৈন্যবাহিনীর কাছে সিদুর গ্রেপ্তার হওয়া। সিদুকে ভগ্নাডিহিতে ফাঁসি দেওয়া হয়। তবু-ও সাঁওতালরা নতিস্বীকার করল না।

সুন্দরা নদীতীরে অনেক সেপাই মারা পড়ে সাঁওতালদের হাতে। খয়রা শোলের কাছে লেফটেনান্ট টৌলমিন নিহত হন।

আষাঢ়গেল, শ্রাবণ এল। সাঁওতালরা দলে দলে মরছে তবুও আত্মসমর্পণ নয়। জঙ্গলে আত্মগোপন করে তারা গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ সৈন্যরা সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং সামনে যাকে পাচ্ছে নির্বিচারে গুলি করছে। তবুও সিদুর স্মৃতিকে বুকের মধ্যে সংগুপ্ত রেখে ওরা লড়াই করেছে।

ক্যাপ্টেন শেরিবিল এবং মেজর শাকারা সাঁওতালদের জব্দ করতে না পেরে 'বর্বর মানুষদের শিক্ষা দেবার জন্য বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেল' পাইকারী ভাবে নরহত্যা করে। নিহত নরনারীর রক্তে রাজমহল পাহাড় লাল হয়ে গেল।

ইংরাজ সেনানীরা কল্পনাও করেনি যে সাঁওতালরা সাদা চামড়ার মানুষের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধা রাখে। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে পঞ্চাশ হাজার বুনো সাঁওতাল, সুশিক্ষিত পনেরো হাজার আগ্নেয়াস্ত্রীর সঙ্গে লড়াই করবে দিনের পর দিন। মেজর জারভিস পাইকারী নরহত্যার পক্ষে ছিলেন না। বলেছেন, একে কি লড়াই বলে? ওরা তীর চালিয়ে আমাদের লোকদের মারে বটে, কিন্তু এভাবে বুক ফুলিয়ে বন্দুকের সামনে এগিয়ে আসতে পারে এমন মানুষ আমি আগে দেখিনি। (পৃ ৮৯) তিনি আর-ও বলেন : "স্বাধীনতা লাভের জন্য এমনি করে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলতে কোন জাতিকে দেখা যায়নি। নিপীড়নের জগদ্দলচক্রে ওরা এমনভাবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল মহাজন-ব্যাপারী-আমলা পুলিসের হাতে যার জন্য ওরা শেষ পর্যন্ত উন্মাদের

মতো বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়।" (পৃ. ৯২) তারা যোদ্ধা। যুদ্ধ থেকে সরতে জানে না, থামতেও না। তাই সারেন্ডারের নির্দেশ শুনে সাঁওতাল জোয়ান তীর ছোড়ে। অবজ্ঞা তাদের চোখে মুখে। একটি ঘরে মৃত স্তূপের মধ্যে এক আধ বুড়ো সাঁওতাল কুড়ুল নিয়ে আহত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল ইংরেজ সৈনিক। আহত যোদ্ধা সৈন্যটির মাথা এক কোপে নামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলির শব্দ শোনা গেল। এক অরণ্য পুরুষকে মারতে অনেক বেশি ছিল গুলি কিন্তু অনেক বেশি বুকের রক্ত দিয়ে ওরা মুক্তির স্বপ্ন দেখে গেল। (পৃ. ৯৪)

গল্পের বিস্তার এই পর্যন্তই। লেখক খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত ধরেছেন। কাহিনীর মধ্যে অনেক ঘটনা বা চরিত্র নেই। সংগ্রাম মুখর মানুষের বেদনা কাহিনী তিনি কুশলতা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাহিনীর এক মুখিনতা আছে, আড়ম্বর নেই। সিদু-কানুর জীবনসংগ্রাম চিত্রিত হয়নি। কাহিনীর বন্ধনে ইতিহাস বিষয় প্রধান হয়ে উঠেছে। ছোট গল্প অখণ্ডতার স্বাদবাহী নয়। অনিঃশেষ ব্যঞ্জনার মধ্যে গল্পের শেষ হয়েছে ; শেষটা রমণীয়।

চতুর্থ পর্ব ॥

নাটকে গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

এক. ···মরেও যারা মরে না···

সাঁওতাল যুদ্ধ বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ভিত্তি সম্পর্কে লেখকের বক্তৃতায়িত ভঙ্গিটি লক্ষণীয় ;—আড়তদার মজুতদার "বৃটিশ সরকারের সাহায্যে তারা চাষীদের উপর নানারকম জুলুম শুরু ক দিলে। চাষীরা সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরে রুখে দাঁড়াল। তারা ইংরাজ, জমিদার, আড়তদারদের রক্তে বাংলা বিহারের মাটি রাঙিয়ে উড়িয়ে দিল রক্ত নিশান। ইতিহাস বলে সাঁওতাল বিদ্রোহ, কিন্তু আসলে ওটা কৃষি বিপ্লব। বিশ্বের প্রথম কৃষি বিপ্লব হয়েছিল আমাদের ভারতে। কৃষকরাই জাতির প্রাণ—এই কথার উপরেই আমার এই নাটক রচনা।"[২৫]

লেখকের উক্তিতে বঞ্চিত, দরিদ্র নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা অভিব্যক্ত—তথাপি কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও সাঁওতাল জনজাগরণের অভিনবত্বের জন্য চিরকাল স্মরণীয়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে দেশীয় জমিদার, মহাজনদের স্বার্থ সমসূত্র করে দেখা সমীচীন নয়। তবে এদের ভূমিকাও বড় কম নয়। ফলত, শোষণসূত্রে এসেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় হতে মুক্তিকামী মানুষ, যাদের একান্ত

নির্ভরতা ছিল কৃষির ওপর ; তারাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং কৃষকরাই এ বিদ্রোহের শক্তি।

এই নাটকের নায়ক কানু। স্বভাবতই তার উপস্থিতি একটু বেশি। কিন্তু সিদু তার শক্তি। ভূমিকাটিও বিরাট। কানুর স্ত্রী ঝুমকি ও সিদুর প্রেমিকা ছিবলী তারাশঙ্করের উপন্যাসের রুকনী টুকনীকে মনে করায়। এখানে কানু সাঁওতালদের শুভোবাবু (রাজা) বলে স্বীকৃত হয়। সিধু তার সহযোগী, যোগ্য সেনাপতি।

সিদু-কানুর পিতা পরগণাইত চুনার মাঝির মনেও দুর্বার অসন্তোষ। "ই আমার জমিন, আমার জান থাকতে খাজনা আমি দিব নাই। আমি কিষাণ, হাল ধরে চাষ করি, সোনার ফসল ফলাই, তাই ই-জমির মালিক জমিদার লয়, এংরেজ লয়, ইর একমাত্র মালিকানা আমার।" (পৃ. ৪০) এই অসন্তোষের বিস্তার সারা নাটক জুড়ে। কারণ, জমির মালিকানা স্বীকার করে না মহাজন মুংগলাল ভগত। সে ভাবে, সাঁওতালদের জমিজমা, শস্য সম্পদের মালিক সে। কিংবা জমিদার মহিম রায় সে-ও ভাবে সাঁওতাল মুলুকের খাজনা তারই প্রাপ্য। তা না পেলে সাঁওতালদের জমিজমা সব কেড়ে নিতে পারে।

মহাজন ভগত যখন সিদু-কানুকে ডাকাত সাব্যস্ত করে পুলিশ কমিশনারের কাছে বিচার চায়, তখন সিদু বলে—"ডাকাত আমি নই ভগত ডাকাত তুরা। আমাদের বুকে বসে তুরা দিনরাত ডাকাতি করছিস ?…তু বিচার কর সাব, কিনো দশ টাকা ধার নিলে উর কাছে আমাদের জন্মভোর খাটতে হয়। কিনো দশ পালি ধান নিলে তিরিশ পালি দিয়াও শোধ হয় না ?" (পৃ. ৫৮) তারা প্রকৃতই বিচার চায়, জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আদালতের বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে, দারোগা, নায়েব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু বিচার তাদের পক্ষে হয়নি। তাই বিচার-দণ্ড তারা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। রেলকর্মচারী নিকেলসনের কামনার বাষ্পে যখন সাঁওতাল রমণী বলি হয়— তখন সিদু তার চরম দণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, দেবার আগে বলে : "মরবার আগে তু শুনে যা এংরেজ, আমরা কিষাণ, সুভ্য মানুষের পায়ের তলায় পড়ে থাকি। কিন্তুক যি আমাদের পায়ে মাড়াতে যাবে তার পা দুখানা আমরা ভেঙ্গে দিব। যি আমাদের মিয়াদের গায়ে হাত দিতে যাবে, তাকেই তুর মত এই টাঙ্গীর কোপে মরতে হবেক।" (পৃ. ৭০)

নাটকের পার্শ্ব চরিত্রগুলির মধ্যে মহাজন ভগতের পুত্র রামলালের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মানবিক গুণগুলি তার মধ্যে যথেষ্ট। পিতার চরিত্রের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। সে সাঁওতালদেরই সমব্যথী। সাঁওতাল রমণীর সতীত্ব রক্ষার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। তার এই মহতী কর্মের মধ্যেই নাটকের climax ধরা পড়ে।

নাটকের মধ্যে দীনেশ দারোগার নিষ্ঠুর ভূমিকা, কর্ণেল জেমসের সৈনাপত্য,

খ্রীস্টান সাঁওতাল চূড়ামাঝির বিশ্বাসঘাতকতা, সিদু ও ঝুমীকে কেন্দ্র করে কানুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভুবন ভট্টাচার্যের ঔদার্য নাটককে গতিদান করেছে। সব মিলিয়ে নাটকে লক্ষিত হবে কাল্পনিক চরিত্রের মিছিলে ইতিহাসের কিছু অনুসরণ ঘনিষ্ঠ ও স্পষ্ট।

দুই. ···সাঁওতাল বিদ্রোহ··

নাট্যকার মন্মথ রায় 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে একটি নাটক রচনা করেছেন।[২৬] এতে নাট্যকারের অন্বীক্ষা ও কল্পনা লক্ষণীয়ঃ "সারল্যের ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু-মহাজন নির্লজ্জভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছে নিরীহ সাঁওতালদের পায়ে···নিরক্ষর সাঁওতালদের সরলতার সুযোগ নিয়ে লুণ্ঠনের যে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছে মহাজন গোষ্ঠী, সে নাগপাশ হতে মুক্তি আছে কি তাদের? আমরা···অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছি আধুনিক সভ্যতার আবরণে স্বার্থান্ধ মানুষের অমানুষিক বর্বরতার এক করুণ ইতিহাস।"

নাটকে মহাজন ও রেল ঠিকাদার নিমাই চৌধুরীর শোষণ-অত্যাচার কথিত হয়। সে ঠিকাদারী কাজ নিয়মিত রাখার জন্য সাঁওতাল রমণীদের ইংরেজদের কাছে ভেট পাঠায়। অথচ তারই পুত্র মানিক চৌধুরীর সে সব কাজে সায় নেই। (পৃ. ২৪) সে সাঁওতালদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে।

নাটকের গতি অবশ্য তরতর করে এগিয়ে যায় যখন মাণিক সাঁওতাল রমণীর কাছে আত্মসমর্পন করে। সাঁওতালদের প্রতি তার নিবিড় টান, গভীর সহানুভূতি। এর-ও অন্যবিধ কারণ আছে। তার জট খোলে, কানুর হাতে ছুরিকাঘাতী মৃত্যুপথ যাত্রী নিমাই চৌধুরীর শেষ জবানীতে। —"ও আমার ছেলে বটে, কিন্তু সাঁওতালীর পেটে ওর জন্ম – ও সাঁওতাল।" আরও বলে, "মরতে বসে মিথ্যে বলবোনা মাণিক। তোকে বামুন বলে চালিয়েছি। বামুনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। সে পাপের প্রতিফল—পেলাম আজ হাতে হাতে।" (পৃ. ৫১)

এখানেই নাটকের চরম উৎকর্ষ ধরা পড়ে। কারণ, সাঁওতাল দরদী মাণিক নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। তাই তার হাতে বন্দুক গর্জে ওঠে ঘুষখোর মহেশ দারোগাকে হত্যা করতে। মাণিকের এই কাজের মধ্যে সিধু ও প্রণয়িনী টিয়ার মাণিককে দেবদূত বলে মনে হয়। তাদের মনে হয় বোঙ্গা ঠাকুর তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। লড়াইয়ের জন্য ঠাকুর পুঁথি দিয়ে গেছেন। তবুও টিয়ার মনে সংশয়। তাই সিধু তাকে বলে—"ঠিকাদারকে (মাণিক চোধুরী) তু ভালবাসিস্। ঠিকাদার যা বলবে তা তুর মনে ধরবে। তাই ঠিকাদার হয়ে তুর কাছে এলেন ঠাকুর। তা যদি না হবে ঠিকাদার কুথায় পাবে এ পুঁথি? জমিদার মহাজনদের সঙ্গে হামরা যে লড়াই করবে—তারই এই হাতিয়ার।" (পৃ. ৫৩)

নাটকের কুশীলবদের মধ্যে আছে দীঘি থানার দারোগা রামশরণ। আর সাঁওতাল ক্রীতদাস ভৈরব। রামশরণ সৎ অফিসার। রামশরণ নিমাইচৌধুরী ও জমিদারের নায়েব ধর্মরাজকে শাসিয়ে বলেন: "জমিদার আর মহাজন আপনারা মশাই এই নিরীহ মানুষগুলোর উপর এতকাল যে torture করেছেন—তার ফলেই আজ এই rebellion. Yes I believe it." (পৃ. ৪৬) অথচ, বড় দারোগা, মহেশ, সে ঘুষের হাতছানিতে ছুটে যায় মহাজনদের স্বার্থরক্ষার্থে। কিন্তু অনিবার্য তার মৃত্যু পরিণতির মধ্যে দুর্জনের পরাজয় ঘটে।

নাট্যকার সাঁওতালদের নির্মম অভিযান, বাজার গ্রাম লুঠ, জমিদার মহাজন ও ইংরেজ নিধন প্রভৃতির তৎপরতা জীবন্ত করে চিত্রিত করেছেন। এসব তথ্যের জন্য হান্টার সাহেবের 'Annals of rural Bengal'—গ্রন্থখানির ওপর নির্ভর করেছেন। ইতিহাসের খুঁট ধরে চলেছেন, অবশ্য ইংরেজের হাতে রচিত ইতিহাস।

নাট্যকার রোমান্স কল্পনার ভাবালুতার একরঙা মূর্তি রচনা করেছেন। কিন্তু মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা নোংরামির ছবি ও ইংরেজের দানবীয় রূপটির নিপুণ চিত্র অনুপস্থিত ॥

তিন. ···বাসিখবর···

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ৫-ই এপ্রিল ১৯৫১-তে টাউন হল ময়দানে মুক্ত অঙ্গনে কলিকাতার 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠীর প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার রচিত ও পরিচালিত 'বাসিখবর' অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই নাটক। নাটকটির প্রতিপাদ্য ছিল কিভাবে ইংরেজরা সাঁওতালদের ওপর শোষণ অত্যাচার চালাতো এবং সিধু ও কানুর নেতৃত্বে কিভাবে 'হুল' অর্থাৎ বিদ্রোহের জন্ম নিল। এই নাটকে দেখানো হয়েছে দ্বারকানাথ-রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজ তোষণ। এঁদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। এরজন্য প্রকৃত জাগরণ চাই। তাই বলা হয়েছে—"সময় কি এখনও হয়নি?" বাদল-বাবুদের এই নাটকটিকে বলা হয়েছে তৃতীয় আঙ্গিকের নাটক। অর্থাৎ মুক্ত অঙ্গন, মুক্ত সজ্জা প্রায় বিনা খরচায় স্বল্প দৈর্ঘ্যে প্রতীকী বিষয়বস্তু উপস্থাপনই এর বৈশিষ্ট্য ॥

···যুদ্ধের গান···

"সাঁওতাল সংস্কৃতিতে নৃত্য গীত অঙ্গীকারবদ্ধ। এরা সুখেও গায়, দুঃখেও গায়। সরল জীবনচর্যার মতই সাঙ্গীতিক ভাবরসের উৎসার হয়। তাই এদের মনের অভিব্যক্তি সুর লহরে উদ্বেল হয়। এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠের দ্রুতান্বিত বিনিময়ে কিংবা অনেক কণ্ঠের সম্মিল বন্ধনে রসভাব বন্দী হয়।"[২৭] এখানে আমরা কয়েকটি গান—সাঁওতাল জনজাগরণের গান ; সংকলন করছি। এই সংকলন থেকে তাদের আবেগ-বিদ্রোহ, দীপ্ত আহ্বান ও হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হবে।

১.

'দেলায়া বিরিদ্‌পে দেলায়া তিঙ্গুন পে,
জানাম দিশম লোগিৎতে হো,
দেলায়া পায়ারঃক' তাবোন পে।'
অর্থাৎ—ওঠো জাগো,
এস জন্মভূমির জন্য
আমরা এগিয়ে যাই।

২.

'সিঞবির সেন্দরাক সেনক্‌' আ
রমঝম তালা ঞিবা ;
কালুকাটা দরবার ক সেনক্‌' আ
সিঙ্গে সিঞ সিঙ্গে ঞিদা।'
অর্থাৎ—সিঞ জঙ্গল শিকারে যায়
সরগরম মাঝরাত ;
কলকাতা দরবারে যায়,
সারাদিন সারারাত।

'দে বয়হা হিজুঃক্‌পে দেলা বয়হা নাতেন পে,
হায়রে হায়রে। ভগত কেনারাম ;
ঘোড়ার উপর পালান্‌ উপর সাওয়ারালাং কেনারাম
ধু... কুলি যাইছে টাপ টাপ।'
অর্থাৎ—এস ভাই এস শুন
হায় হায়। ভগত কেনারাম ;
ঘোড়ার পিঠে জিনের ওপর সওয়ারী কেনারাম
রাস্তায় রাস্তায় টগবগিয়ে যায়।

৪

'পারগাণা ইঞদাহ নাডকেদে পারগাণা ইঞ দাঁড়ে কেদে
হায়রে হায়রে। মিছাপুর মেলা ;
কেনারাম দারোগা পেয়াদা নুপার তে,
হায় হায়রে। মিছাপুর মেলা।'

অর্থাৎ পারগাণার কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করলাম
হায় হায়। মিছাপুর মেলায়
কেনারাম দারোগা পেয়াদার জন্য
হায় হায়। মিছাপুর মেলায়।

৫.

'কাটজীবা দারোগা কুরমুটাহা পেয়াদা
জিউয়ীরে দো সুকগে দো বাং।
দারোগা ঘোড়ার উপর টাপ টাপ-৩
কোমর পেটে পিতর পাটা পেয়াদা ঝাক ঝাক-৪
জিউয়ীরে দো সুকগে দো বাং।'

অর্থ: নির্দয় দারোগা প্রতিহিংসাপরায়ণ পেয়াদা,
মনে প্রাণে সুখ নেই,
দারোগা ঘোড়ার উপর টাপ টাপ যায়-৩
কোমরে পেতলের বেল্ট, পেয়াদাদের উজ্জ্বল পোষাক-৪
মনে প্রাণে সুখ নেই।

৬.

'বাকো লুতুরা কু'খান বাকো হেতওয়া কু'খান,
হায়রে হায়রে। ভগত কেনারা…ম
নোয়ারাবোন নুসোসাবোন বাংগেকো তেঙেগান,
দঃকু' বোন দানাংবোন বাংগেকো রেবেন,
তবে দো বোন হুল গেয়া হো।

অর্থ: কেউ না শুনলে কেউ না গ্রাহ্য করলে,
হায় হায়। ভগত কেনারা…ম,
আমরা নিজেরাই বাঁচব কেউ পাশে দাঁড়ায় না,
আমাদের সাহায্যের আশ্রয় দিতে কেউ রাজী নয়
তবে আমরা বিদ্রোহ করব।

৭.

'নেরা নিয়া নুরু নিয়া
ডি'ডা নিয়া ভিটা নিয়া,
হায়রে হায়রে। মাপাকু' গপচু' দো
নুরিচু নাঁড়াড় গাই-কাডা, নাচেল লোগিৎ পাচেল লোগিৎ
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্রাম রুওয়াড় লোগিৎ
তবে দো বোন হুল গেয়া হো।'

অর্থ : স্ত্রী পুত্রের জন্য
জমি জায়গা বাস্তুভিটার জন্য
হায় হায়! এ মারামারি এ কাটাকাটি
গো-মহিষ, লাঙ্গল, ধনসম্পত্তির জন্য
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।

৮.

'নুসৌসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হ' বাকো তেঙেগান,
খাঁটি গেবোন হুল গেয়া হো,
খাঁটি গেবোন হুল গেয়া হো,
দিশম দিশম দেশ মৌঞজহি পারগাণা
নাতো নাতো মাপাঞজি কো
দঃকু' বোন দানাংবোন বাংগেকো তেঙ্গোন
তবে দো বোন হুল গেয়া হো।'

অর্থ : আমরা নিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
গ্রামের মানুঝি ও পরগানারা
গ্রামের মোড়লরা
আমদের সর্বপ্রকার সাহায্য করবে, কেউ পাশে দাঁড়াবে না,
তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব।

৯.

'ধানজুড়ি হে
ঢোল বাজে হে
ঢাক বাজে হে
সিদো কানহু, চাঁদ ভায়রো
হুলে হু…লে
হুলে হু…লে
হুলে হু… লে
হুপচু' হুপুচু' দেলাং জা দেলাং জা
হুপুচু' হুপুচ' দেলাং জা দেলাং জা
হুপুচ হুপুচ দেলাং জা দেলাং জা।'

অর্থ : শুনহে ধানজুড়িবাসী
ঢোল বাজছে
ঢাক বাজছে
সিদো কানহু, চাঁদ ভায়রো
বিদ্রোহ বি…দ্রোহ
বিদ্রোহ বি…দ্রোহ
বিদ্রোহ বি…দ্রোহ
চল্ চল্ শীঘ্র চল্
চল্ চল্ শীঘ্র চল্ শীঘ্র চল্
চল্ চল্ শীঘ্র চল্ শীঘ্র চল্

১০.

'সিদো কানহু খুড়খুড়ি ভিতরে,
চাঁদ ভায়রো ঘোড়া উপরে,
দেখ সে রে। চাঁদরে। ভায়য়োরে।
ঘোড়া ভায়য়োরে মুলিনে মুলিন।'

অর্থ: সিদো কানহু পাল্কিতে চড়ে
চাঁদ ভৈরব ঘোড়ায়
দেখনা চেয়ে চাঁদ ভৈরব।
ভৈরব যায় ঘোড়ায় ধেয়ে বিদ্রোহী-
দের পাশে।

১১.

'সিদু কানু হুল দয়
মায়াম গাডা আতুয়েন,
ইংরাজ সরকার আবো দিশম,
মেতাবোন কো সাঁওতাল বিদিন।'

অর্থ: সিদু কানু বিদ্রোহ করেছে
রক্তের নদী বয়ে গেল,
ইংরাজ সরকার বলে আমাদের দেশ,
আমাদের বলে সাঁওতাল নাস্তিক।

১২.

'চেদাঃক' দরে সিদু হো
মায়ামতে দমনু মেন ?
চেদাঃক্ দরে কানহু হো
হুল হুলেম মেমেন ?
জোত ভাই ক লোগিৎ
মায়ামতে দএএনুমেন,
বেপারীয়া কোম্বড়ো হায়রে
দিশম দক হুহী।' ২৮

অর্থ: হে সিদু কেন তুমি রক্তে স্নান করলে ?
হে কানহু কেন তুমি বলছ 'হুল' 'হুল' ?
জাত ভাইদের জন্য আমি রক্তে স্নান করেছি,
দস্যু ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশ লুণ্ঠন
করেছে।

১৩.

আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, দুঃখ দেবার যম
তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধম ?
মোরা শুধু ভুখবো ?
না, না মোরা রুখবো।

১৪.

ও শিধো, শিধো ভাই, তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে
কি কথা রইল গাঁথা, ও কানহু, তোর হুল হুল স্বরে,
দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্তে রাঙা বেশ
জানো কি দস্যু বণিক লুটলো সোনার দেশ।২৯

১৫.

কেনারাম বেচারাম
পাঁপড়াজুড়ির জমির লোভে
লিটিপাড়ার মাঝিকে বেঁধে
সাহেবের কাছে নিয়ে এলে
আমড়া পাড়ার পুলিশ
জঙ্গিপুরের দারোগা শোনো
সিদো আর কানুহুকে
মিছামিছি বাঁধলে কেন ?
আমড়াপাড়ার ভকত
কেনারাম ভগত শোনো
সিদো আর কানুহুকে
মিছামিছি বাঁধলে কেন ?
পাকুড়থানা আমড়াপাড়া
পিরথি সিং-এর আপিসে
মিছেই হাকিম বাঁধলো তারে
কড়া দড়ির ফাঁসে।
সিদো, তুমি কেন রক্তে ভেসছ
কানুহু তোমার বুলি শুধু হুল হুল
হড়ের জন্য হুলের রক্ত বইছে
দীকুরা তাদের ভিটে মাটি গরু খেয়েছে।[৩০]

১৬.

কেনারামের কারবার
বলি কত বারবার
পরগণারা শুনেও তা শুনে না।
পেয়াদাটা বেজায় পাজি
দারোগাটা সাক্ষাৎ যম
বলি কত কেহ তো শুনে না।
কেহ না শুনিলে তবে
হবে হুল হুল হবে
ছেলে পুলে বেঁচে যাবে
হুল ছাড়া কেহ তো রবে না
হুল হলে সব পাব
কেনারামে শিখাইব
দারোগারে পেয়াদারে ডরি না
এরা সবাই মাতি হুলে
রুম হবে হুল হলে
কেড়ে নিব নিজ বলে
ঘর গরু ছেলে পুলে
এস সবাই মাতি হুলে
রুম হবে হুল হলে।[৩১]

১৭.

বাঁকুড়ায় হুলের গান পাওয়া গেছে। যেমন ;

সিদো আর কানুহু পালকিতে
চাঁদ আর ভেরো ঘোড়ার পিঠে
ভৈরোকে কেন শুকনা দেখায় ঘোড়ার পিঠে।
এ দিকেতে সন্তভুঁই ও দিকেতে শিকারভুঁই, বাবু নিলু সিং
ওগো বাবু নাদু সিং, যদু জমাদার
তোমাদের যেতে দিব না শিকারভুঁই পেরিয়ে
ওগো বাবু নাদু সিং, যদু জমাদার।[৩২]

১৮.

বণিক দস্যুরা
আমাদের ভূমি হরণ করেছে।
সাহেবদের শাসন ভীষণ কষ্টদায়ক
আমরা যাব কি আমরা থাকব ?
থাকা, পরা, খাওয়া
সবই গোলমালে
আমরা যাব কি আমরা থাকব ?[৩৩]

১৯.

সয়্যালক পাহাড়ে
দত্তো মাঝির কন্যা
দিয়াছে গলায় দড়ি আম-গাছের ডালেরে
গোপীকান্দার বাংলোতে
ডেপুটির আদালতে
সে আমাদের বিচার করবে।[৩৪]

২০.

মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসেনি।
মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে যাবে না।
মাটি তোদের,—
যারা মাটির সন্তান হয়ে মাটিকে হাসায়।
যারা প্রথম আগুন আবিষ্কার করে
আমরা সেইসব মানুষের এক গোষ্ঠী
মেয়েদের যারা প্রথম স্বাধীনতা দেয়
আমরা তাদের একজন
প্রথম লোহার ব্যবহার যারা করে
তীর ও লাঙলের ফালে
আমরা তাদের একজন
এই অরণ্য ও মাটির প্রথম সন্তানদের
একজন, একজন, একজন, আমরা
সভ্যতা আমাদের হাত ধরে কালো জঙ্গলে ঢুকেছিল।
তাই—
আজ আমরা চলেছি আমাদের অধিকার রাখতে।

বীরসিংহ বাজায় নাগরা
চন্দ্রো বাজায় দুমদুমি
মেঘসিংহ বাজায় মাদল
সিদু পাঠায় শালগিরা
কানু পাঠায় তীর
আমরা এসেছি আমাদের অধিকার রাখতে।
কে তুমি বলো হুল্ আমাদের পাগলামি ?
কে বলো হুল্ একটা ক্ষ্যাপা ঝড় ?
হুল্ আমাদের অধিকার ফিরে পাবার হাতিয়ার
হুল্ আমাদের হাতে তুলে দেবে দেশ ও রাজ্য।[৩৫]

২১.

"অবায় হুকুমতে অবায় বলেতে
ইংরেজ সরকার সিপাহী দম্ মাংগকে দেয়া
সিদু হুকুমতে নায়গো কানু বলেতে
ইংরেজ সরকার সিপাহী দঞ মাংগকে দেয়া
তিরেতাম হাড়ী বাজাল জাংগারেতাম বাড়ী
আর দম্ চালাঃক্ কান বাজাল সিউড়ি হাজাততে
তিরিতিঞ তিরিয়ো নায়গো গাংসা বিতিঞলিপুর
ইঞ দঞ চালাঃক্ কান নায়গো সিউড়ী মেলা (এঞল)[৩৬]

[বাজাল নামে একজন ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের সিপাহীকে হত্যা করে। বাজালের মা জিজ্ঞাসা করল তুমি এমন করলে কেন ? বাজাল বলল সে সিদু-কানুর আদেশে সিপাহীকে হত্যা করেছে। বাজালের মা বলল, তোমার হাতে বাঁধন, লাঠির মার পড়বে, সিউড়ির জেলে যেতে হবে। বাজাল শুনে হেসে বলল, আমার হাতে বাঁশি আছে, পায়ে ঘুঙুর আছে ; গান ও বাঁশি বাজাতে বাজাতে সিউড়ির মেলা দেখতে যাব।]

২২.

বুরু চেতান তে
ওকোয়রেণ পোস্ত সাদম লিকির-লিকির
সোনাতে সাজ সাদম, রুপাতে বাজ সাদম
সিধোরেন পোস্ত সাদম লিকির-লিকির

অর্থ : অদূরে ঐ পাহাড় চূড়ায়
সাদা ঘোড়ায় কে ছুটে যায়—
সোনার তাজে, রূপার সাজে সাদা ঘোড়া ছুটছে ঐ
সিদু হড়ু তার সওয়ারী, আমার পানে তাকায় কই ।। ৩৬-ক

এসব লোকগানে সাঁওতালদের সংগ্রামী মানসের পরিচয় মেলে। যদিও তাদের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত ট্রাজিক পরিণতিতে পর্যবসিত ; তবু-ও সেসব দিনের কথা মনে করে সাঁওতাল সমাজ অন্বেষণ করেন সুখ ও বেদনার মহত্তম দিনগুলি, স্মৃতি হিসাবেই। গানগুলি যুদ্ধ ও প্রাক্‌যুদ্ধ পর্বের। গানগুলি তাদের ক্ষোভ, রোষ, অন্তলীন বেদনার চিত্র বহন করে।

অবশ্য লক্ষিতব্য। বেশকিছু গান ডব্লু. জি. আর্চার সাহেব 'ম্যানইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় অনুবাদ করেছিলেন ১৯৪৫ সালে। ক'টি দৃষ্টান্ত : ৩৭

১.

'Kenaram Becharam
Longed for land in Piparijuri
They bound the Litipara manjhi
And took him to the Sahib's door'.

২.

'The Sub-inspector of Amrapara
The Daroga of Jangipur
Sidu and Kanu
For nothing they were bound '

৩.

In the Kadam at the village end
Is a parrot Sitting
Kanhu
It is eating a book
Catch it Kanhu
Kill for an Omen

৪.

In Amprapara
In Pakur Thana
In the office of Pirthi Singh
For nothing, nothing
The Hakim tied him with a rope

গান : স্মরণে-মননে

এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদের
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায়
যারা ও শাসক আর হীন শোষকের
বিরুদ্ধে করেছে লড়াই।
জোরকোরে যাদের সে জমির ফসল
নিয়েছিল কেড়ে ঐ জমিদার দল
(আর) ঠকিয়ে নিয়ে যাদের শেষ সম্বল
মহাজন ফেঁপেছে টাকায়।
এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদের
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায় ॥

(২) "মহাজন, জমিদার, আর বৃটিশের
নিষ্ঠুর শোষণ, পীড়ন
সইবনা" বোলে যারা সর্ব্বপ্রথম
কোরে উঠেছিল গর্জ্জন—
তারা সেই সিধু, কানু, ভৈরো ও চাঁদ
ছিঁড়ে যারা এক সাথে ক্রীতদাস ফাঁদ
দিতে সাঁওতালদের মুক্তির স্বাদ
(ওরা) দিয়েছিল ডাক চার ভাই।
এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদে
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায়।

(৩) সিধু কানুদের গ্রাম ভগ্নাডিহীতে
তাই ওই শোষিতের দল
গোমানীর তীরে তীরে এসেছিল ছুটে
যুদ্ধের বাজিয়ে মাদল।
শোষণ ও শাসনের করে দিতে শেষ
গায়ে গায়ে ওরা তুলেছিল রণবেশ।
না ছিল ওদের মাঝে কোন ভয় লেশ
মুক্তির প্রথম উষায়।
এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদের
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায়।

(৪) যাদের অমর গাথা হয়েছে লেখা
'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে
'জেবলেছে অরণ্যবহ্নি' তারাই
একদা পাহাড়ী গ্রামে, গ্রামে।
হাতে নিয়ে টাঙ্গী, টেঁঠা ও ধনুক-তীর
করেছিল গোরাসেনাদের অস্থির।
(ওরা) ধনী মহাজন ও শোষক শ্রেণীর
বাজ হেনেছিল যে মাথায়।
এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদের
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায়॥

(৫) ওদের সঙ্গে বহু কামার, কুমোর, চাষী—
আর তাঁতী ভয় বাধাটুটে।
সকলেই এক সাথে রণহুঙ্কার দিয়ে
গেছিল সিউড়ী পথে ছুটে।
বৃটিশের হাতে ওরা শতশত প্রাণ
শুনি সে সমরে দিয়েছিল বলিদান।
ছিল ফাঁসি-দড়ি গলে দোদুল্যমান
গাছে গাছে "কেঁদুয়া ডাঙায়"।
এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদের
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায়॥

(৬) ওদের মহান নেতা শৌর্য্যে বীর কানু
ফাঁসির রজ্জু গলে নিয়ে
শোষণ বিরোধী গণসংগ্রাম-বীজ
এ মাটিতে গেল পুঁতে দিয়ে।
ওদের স্বপন হবে সফল সেদিন
সমাজ যেদিন হবে শোষণ বিহীন।
নইলে লড়াই-ধ্বজা রবে উড্ডীন
এ রাঙাভূমির কলিজায়।
এসো সেই সংগ্রামী সাঁওতালদের
নাম মোরা স্মরি শ্রদ্ধায়। *

* 'হুল দিবস' পালন (৩০ জুন, ১৯৫২) উপলক্ষে সিধু কানু উপজাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র (সিউড়ি, বীরভূম) থেকে প্রকাশিত 'সিধু-কানু স্মরণিকা'-তে গানটি সংযোজিত। এটি রচনা করেছেন আশানন্দন চট্টরাজ। শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পটের গান : সিদু কানুর ফাঁসি

মেদিনীপুর নয়াগ্রাম নিবাসী দুখু শ্যাম চিত্রকর সিদু কানুকে নিয়ে পট এঁকেছেন, গান বেঁধেছেন। পটের গান করাই তাঁর পেশা। তাঁর গানের বিষয়-বস্তু-ও বিচিত্র। সমসাময়িক সামাজিক, পোলিক্যাল আন্দোলন তাঁকে স্পর্শ করে। আবার ইতিহাসের মধ্যে যুগবিপ্লব খোঁজেন তবে ইতিহাসের খুঁট ধরে নয়। তাঁর গানে চিত্রাভাস ও গীতিরস উৎকর্ষ নয়, প্রকাশে দৈন্য ও দুর্বলতা আছে। এই ত্রুটি আন্তরিকতার অভাবে নয়, রূপকর্মে অনৈপুণ্যতার জন্যই। তবে তিনি দ্রষ্টা না হতে পারেন, স্রষ্টা-তো বটেন। যাইহোক, মঞ্জুল বাক্‌সর্বস্ব গানটি প্রদত্ত হলো।

শুনেন শুনেন সর্বজন শুনুন দিয়া মন
সিদু কানুর কথা কিছু করিব বর্ণন।
সিদু কানুর নামে তারা ছিল দুটি ভাই
ব্রিটিশ তাড়াবে তারা করেছে লড়াই।
লড়াই করে বারে বারে বলে দুই জন
ব্রিটিশকে তাড়াতে হবে কর আন্দোলন।
মা বোন, ভাই বন্ধুরা শুনেন ভারতবাসী
ব্রিটিশকে তাড়াতে তারা হইল উল্লাসি।
সবাই মিলে দলে দলে করে আন্দোলন
ব্রিটিশকে তাড়াবো মোরা, এই মোদের পণ।
এই বলিয়া যায় চলিয়া যুদ্ধ বাঁধাইল
কতশত নরনারী প্রাণ হারাইল।
অনেক মরে ব্রিটিশরে দিচ্ছে তো হুংকার
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে বাজিল ঝঙকার।
পতাকা নিয়ে রাস্তায় গিয়ে আন্দোলন করিল
আদিবাসী সমাজেতে হই হুল্লোড় পড়িল।
যতসব ভারতবাসী একই সুরে কথা
ব্রিটিশকে তাড়াব মোরা একই বারতা।
যুদ্ধ শুরু পশু গরু অনেক মরে ভাই
মহামার* হাহাকার রইতে নাহি ঠাঁই।

* ভয়ংকর অবস্থা

বনবাদাড়ে ঘরের দ্বারে আগুন লাগাইয়া
ফন্দি করে ডিয়া* মেরে দিল পুড়াইয়া।
জয়বাংলা জয় বাঙালি একই মোদের প্রাণ
একই সুরে সুর মিলাব হিন্দু মুসলমান।
ব্রিটিশের অনেক দালাল অকালে মরিল
তখন কিন্তু ব্রিটিশের আতঙ্ক হইল।
সিদু কানু ধরা পড়ে ব্রিটিশের হাতে
বিচার করিল তারা ঝুলাবে ফাঁসিতে।
দু'ভায়ের ফাঁসি দিল ব্রিটিশের দালাল
সেই কারণে ভারতবর্ষে চলছে এমন হাল।
প্রথমভাগ পড়া আমার জানাই সবারে
ভুল হইলে মাপ করিবেন এই অধমেরে।
এবার বিচার শুরু কল্পতরু শাসক মহাশয়
ব্রিটিশের কথা শুনলে প্রাণে আসে ভয়।
বিচার হল শুনতে পেল যত ভারতবাসী
বিচারেতে হয়ে গেল সিদু কানুর ফাঁসি।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা
নাম দুখুশ্যাম চিত্রকর নয়া হয় ঠিকানা। **

ষষ্ঠ পর্ব ॥

···গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া—সাময়িক সাহিত্যে···

এক. ···সমাচার সুধাবর্ষণ···

॥ সংকলন ॥ ৩৮

সংখ্যা ৪০৬ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৩ শ্রাবণ বুধবার ইংরাজী ১৮ জুলাই ১৮৫৫

রাজমহল হইতে কোন সংবাদদাতা যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার স্থূলমর্ম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন, এই কাণ্ডকে প্রকৃত তিতুমিরের কাণ্ড বলিতে হইবেক।···অদ্যশ্রুত হইলাম যে জিলা ভাগলপুরের অধীন মোং রাজমহলের পশ্চিম অনুমান ৬/৭ ক্রোশ অন্তর ভগ্নাডিহি নামক পাহাড়ে প্রায় দশবারো হাজার পাহাড়িয়া লোক একত্র হইয়াছে, যাহারা ঐ অত্যাচারিদলের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছে তাহারা দুই সহদর, এক দিবস নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এরূপ ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর স্বপ্নে আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এইদেশ তোমারদিগকে প্রদান করিলাম, তোমরা পর্ব্বতীয় লোকদিগের সাহায্যে ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরম সুখে রাজত্ব কর, এই বিষয় কোন ধনাঢ্য যবন শ্রবণ করিয়া উক্ত দেবতার স্থান দর্শনার্থ গমন করাতে তাহারা তাঁহাকে ধৃত করত বন্ধন করিয়া রাখে, এবং ঐ অধ্যক্ষদিগের দলবল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে ঐ যবন বন্ধনাবস্থায় অতিশয় কাতর হইয়া মিনতি প্রকাশ করাতে ঐ রাজ্যলোভি রুজরুক ভ্রাতাদ্বয় তাহাকে ক্ষমা করিয়া আপনারদিগের দলভুক্ত করে ও তিনি তাহারদিগের অধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ঐ সম্ভ্রান্ত যবন এই প্রকার পদ প্রাপ্ত হইলে গোপনীয় পত্র দ্বারা দুইজন দারোগাকে তদ্বিশেষ বিজ্ঞাপন করিলে দারোগা প্রায় ১৫/১৬ জন বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে উক্ত দলাধ্যক্ষ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধৃত করণার্থ গমন করিলে অধ্যক্ষেরা সহচরগণকে অনুমতি করিলেন যে আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর এতদনুমতি শ্রবণে সহচরেরা তৎক্ষণাৎ দারোগাকে বন্ধন করত বরকন্দাজদিগকে নির্দ্দয়রূপে হত করে, এবং অধ্যক্ষদ্বয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বহস্তে দারোগার শিরশ্ছেদন করিয়া অধিকার লুঠ করিবার অনুমতি করিলে তাহারা নানা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক ইংরাজদিগের অধিকার মধ্যে বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে দ্রব্যাদিও অল্প লুঠ করে নাই, প্রজাসকল প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে চারিদিগে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব ও রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করণে বাধ্য হইয়াছে অরঙ্গাবাদের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ দুরাত্মাদিগের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতাছেন, মুরসিদাবাদ হইতে

একদল রাজসৈন্য প্রেরিত হইয়াছে,…পূর্ব্বদেশে তিতুমিয়া ও দুদুমিঁয়া যে প্রকার ইংরাজ অধিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বহুলোক একত্র করিয়াছিল রাজমহলের যবন ভ্রাতারাও তদ্রূপ করিয়াছে।

সংখ্যা ৪২৭ সন ১২৬২ সাল তারিখ ২৯ শ্রাবণ সোমবার ইংরাজী ১৩ আগষ্ট ১৮৫৫।

পয়ার।

অসম্ভব সমাচার শুন সর্ব্বজন।
জন্মিয়াছে সন্তাল নৃপতি একজন॥
অষ্টম বর্ষিয়া কন্যা পরিণীতা নয়।
বিধাতা নির্ব্বন্ধে পূর্ণ গর্ব্ভ হয়॥
সেই গর্ব্ভ হইতে জন্মিল এক শিশু।
রূপে গুণে অবিকল য প্রকাশ যীশু॥
ভূমিষ্ঠ হইলে এই দৈবী বাণী হয়।
শুনরে সন্তালকুল হইয়া নির্ভয়॥
ঈশ্বরাংশে অবতার জন্মিলেন যিনি।
পৃথিবীর সর্ব্বভার হরিবেন ইনি॥
মেলচ্ছাক্রান্তা হইয়া ধরণী পান ডর।
ব্রহ্মহত্যা গো হত্যায় কম্প কলেবর।
তোমরা সকলে মেলি ভক্তি করি মনে।
অভিষিক্ত কর এ শিশুকে সিংহাসনে।
ইঁহাকে পুজিয়া কর অস্ত্রাদি ধারণ।
দলে বলে বচন কর মেলচ্ছাদি মারণ।
পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ড পাবে অধিকার
তারপরে ক্রমে ২ খণ্ডাবে ভূভার॥
এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া সন্তাল।
দলবন্ধ হয় পরে বিক্রমে বিশাল॥
করিয়াছে সেই নবজাত পুত্রে রাজা।
সর্ব্বদা তাহাকে পুজে দিয়া মাংস ভাজা
কালীপূজা করিয়া হরিণ বলি দিয়া।
দিতে হয় তারে সেই মাংস ভাজা নিয়া
হরিণের মাংস বিনা কিছু নাহি খায়
জননীর দুগ্ধ নাই দুগ্ধ নাহি চায়'॥

সেই শিশু আজ্ঞাবহ সন্তাল প্রবাহ।
করিতেছে নানাস্থানে পড়িয়া দিগ্দাহ
এইরূপ জনরব হইয়াছে তথা।
অতএব লিখিলাম অসম্ভব কথা॥
সম্ভব হইতেই বা আশ্চর্য কি তায়॥
ঈশ্বরীয় ঘটনায় সব শোভা পায়।
পঙ্গু যদি লঙ্ঘে গিরি কপি করে গান।
সলিলে পাষাণ ভাসে আছে উপাখ্যান
এ সব সম্ভব যদি তবে বল আর।
আশ্চর্য্য কি রাজা হবে বালিকা কুমার
গেল বুঝি ধর্ম্মপাল ভূপালের কাল।
হইবে অসভ্য জাতি নৃপতি সন্তাল।

সংখ্যা ৪২৯ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৩১ শ্রাবণ বুধবার, ইংরাজী ১৫ আগষ্ট, ১৮৫৫

সন্তালীয় গোলযোগ।
"বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘা"

সন্তালীয় বিদ্রোহিতায় ইহাই ঘটিয়াছে, আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়া ছিলাম বিদ্রোহী প্রদেশে অধিক সেনা প্রেরিত হইলেই সন্তালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিবে আর দেশ লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবেক না, তাহারদিগকে দমনার্থে কয়েকদল সেনা এবং ৩।৪ টা তোপ প্রেরিত হইয়াছে এবং কয়েকবার তাহারা পরাভব পাইয়াছে কিন্তু ইহাতে ভগ্নোদ্যম হয় নাই ৪ আগষ্ট দিবসীয় রাজমহলের পত্রে জ্ঞাতা করে পাকুড়, কদমশাহা এবং মহেশপুর গ্রামের নিকট পুনরায় দৌরাত্ম্যারম্ভ করিয়াছে, ক্ষুদ্র ২ দলে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গ্রামদাহ লুঠ ও প্রাণনাশ করিতেছে, ৩ তারিখে ৩১ সংখ্যক দলের লেপ্তেনেন্ত সিটওয়েল সাহেবের প্রতি তিনবার গুলী মারিয়াছিল কিন্তু কোন হানি হয় নাই, ৪ দিবসে একজন কৃষককে হত এবং মেষ্টর মেসিকছ সাহেবের তিনজন ভৃত্যকে আহত করিয়াছে, ৯ দিবস প্রভাতে দুই সংখ্যক গ্রিনিডিয়ার দলের এক কোম্পানি সেনা বাষ্পীয় শকটারোহণে রাণীগঞ্জ গিয়াছে, শুনা যাইতেছে, রাণীগঞ্জাবধি রাজমহল পর্য্যন্ত স্থানে ২ সেনা থাকিবেক, এ উৎপাত কবে যাইবেক, সন্তালকুলের সর্ব্বনাশ হউক।

সংখ্যা ৪৩৫ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৭ ভাদ্র বুধবার, ইংরাজী ২২ আগষ্ট ১৮৫৫।

রাণীগঞ্জ।

রাণীগঞ্জ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে কয়েক দিবস পূর্ব্বে ৩০০ সিপাহী ও কতিপয় অশ্বারোহীর সহিত ৫০০০ হাজার সন্তালদিগের এক যুদ্ধ হইয়াছে, জয়পরাজয় জানা যায় নাই শুনা যাইতেছে সন্তালেরা অস্ত্রত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া মেং এলিয়ট সাহেবের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই কেননা তিনি বিবেচনা করেন সন্তালেরা এত প্রচুর অর্থ ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে যে তদ্দারা তাহারদিগের দুই বর্ষ চলিতে পারে সুতরাং এখন অপরাধের দণ্ড না দিয়া ক্ষমা করিলে তাহারা পুনরায় অত্যাচার করিবে।

সংখ্যা ৪৩৬ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৮ ভাদ্র গুরুবার ২৩ আগষ্ট, ১৮৫৫।

পাটনা।

সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রে শাহাবাদ নগরবাসি বিখ্যাত কুমারসিংহের নিকট ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ৪০০০ সহস্র সেনা চাহিয়াছিলেন তাহাতে কুমারসিংহ কহেন যদি গবর্ণমেণ্ট আমার রাজস্ব গ্রহণে ক্ষান্ত হন তবে আমি চার সহস্রের পরিবর্ত্তে পাঁচ সহস্র সেনা দিতে প্রস্তুত আছি, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হন নাই, কুমারসিংহ এইক্ষণে অনুদ্দেশ হইয়াছেন অনেকে কহে তিনি তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন কিন্তু সংবাদদাতা কোন বিশ্বস্থ লোক মুখে শুনিয়াছেন কুমারসিংহ সন্তালদিগের সহিত যোগ দিতে গিয়াছেন, এ সংবাদ হইতে পারে কেননা পাটনা নগরে যে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে কুমারসিংহ লিপ্ত ছিলেন, জনশ্রুতি উঠিয়াছে পাটনা ও তদিগন্ত স্থানে মহরমের সময় কোন গোলযোগ হইবেক, বেহার সুবার জবনেরাও বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতেছে অতএব গবর্ণমেণ্ট সাবধান থাকিবেন মহরমের কাল নিকট হইতেছে।

সংখ্যা ৪৪১ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ কার্ত্তিক গুরুবার ইংরাজী ১ নবেম্বর ১৮৫৫

লোকেরা কথায় ২ প্রসঙ্গভেদে দুইটী কথা বলিয়া থাকেন, সন্তাল দলের গোলমালের কথায় ২ আমারদিগের সেই দুইটী কথা স্মরণ হইল প্রথম কথা এই যে "ঘরে ছুঁছোর কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন" দ্বিতীয় কথা এই "ধরিতে না পার ইন্দুর, করিতে যাও বাঘ বন্দি", এইক্ষণে উক্ত দুই বাক্যই আমারদিগের রাজ্যেশ্বরকে লক্ষ করিয়াছে, ঘরের মধ্যে বনজন্তু সন্তালেরা প্রজানাশ গ্রামদাহ প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, রাজকুল তাহারদিগের কিছুই করিতে পারেন না, অথচ বাহিরে গোলাগুলী সৈন্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন এবং মূষিকতুল্য সন্তাল-

গণকে অদ্যাপিও ধৃত্ত করিতে পারিলেন না অথচ রুষীয় রাজ্যেশ্বরকে বন্ধন করিতে গিয়াছেন, এতদ্দেশীয় কোন স্বাধীন রাজ্যেশ্বর যদি সামান্য বন্যজাতির হস্তে এ প্রকার পরাস্ত হইতেন তবে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেন না, ব্রিটীস জাতির লজ্জা নাই এই কারণে তাঁহারদিগের আহার পরিপাক পাইতেছে,···ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন এ রাজ্য সুশাসিত হইয়াছে এই কারণ রাজ্য মধ্যে উপযুক্ত স্থানে সৈন্য স্থাপন করেন নাই, হিন্দু জাতির ন্যায় শান্ত জাতি কোথায় পাইবেন, হিন্দু জাতি রাজ বিরুদ্ধাচারী নহেন বরং রাজকুলের মঙ্গল চেষ্টা করেন কিন্তু হিন্দু ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্য কোন জাতিকে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সংখ্যা ৪৪২ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র শুক্রবার ইংরাজী ৩১ আগষ্ট ১৮৫৫

অসম্ভব কল্পনাও করা যুক্তি নয়।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ব্রিটিসের জয়।
ভারতের বড় বড় রাজা ছিল যারা।
সংগ্রামে হারিয়া দেখ কোথা গেল তারা।
রাজপরিবারগণ সবে অন্নদাস।
চারিদিগে ব্রিটিসের বিক্রম প্রকাশ।
মারহাট্টা রাজপুত যুদ্ধে মহাবল।
ক্রমে ক্রমে বীর্য্যহীন হইল সকল।
শীকজাতি বন্ধ হলো অধীনতা জালে।
কি করিতে পারে বল অসভ্য সাঁওতালে।

উত্তর।

পশুসম সাঁওতাল কথা মিথ্যা নয়।
কিন্তু তারা বাহুবলে দেশ করে জয়।
অস্ত্রাঘাতে কতলোক করেছে সংহার।
লটীয়াছে কতধন সংখ্যা নাহি তার।
অনলেতে বহুদেশ করে ভস্মময়॥
বাঙ্গালার মধ্যে যেন লঙ্কাকাণ্ড হয়।
সাহেবরা বিবিলয়ে করে পলায়ন।
সপত্নী সহিত কত হয়েছে নিধন॥
বিক্রমে বিশাল যদি শ্বেত কান্তিগণ।
তবে কেন অত্যাচার না হয় বারণ।

সংখ্যা ৪৪৩ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র শনিবার ইংরাজী ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫

সাঁওতালদিগের অত্যাচার এ পর্য্যন্ত কিছুই শেষ হয় নাই, অথচ ইংরাজী পত্র সম্পাদকগণ তাহারদিগের প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য তাহার আন্দোলন করিতেছেন কেহ বলিতেছেন যে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট পেগুরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তথায় প্রজা নাই প্রজাহীন রাজ্যেই রাজত্ব করিতেছেন অতএব সাঁওতালদিগকে পেগুদেশে প্রেরণ করাই উচিত তাহাতে তাহাদিগকে দেশান্তরিত করিয়া শাসন করা হইবেক, অথচ পেগুদেশে প্রজাবৃদ্ধি হইবেক, আবার কেহ ২ বলিতেছে যে সাঁওতালদিগের পদে শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া রেইলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেই সমুচিত শাসন করা হইবেক, তাহাদিগকে ধৃত করিবার বিষয়ে আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে শীতঋতু আরম্ভ হইলে পর্ব্বতীয় বনসকল যখন শুষ্ক হইবেক তখন সেই বনে অনল সংলগ্ন করিলে তাহা ভস্মসাৎ হইয়া যাইবেক এবং সেনাদিগের দ্বারা দুরাত্মারা অনায়াসে ধরা পড়িবেক, এইরূপ ভিন্নপ্রকার কল্পনা করিতেছেন, ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন তাহা কিছুই প্রকাশ নাই, অত্যাচারি দলের অধ্যক্ষগণ প্রকাশ্যরূপে ফাঁসি কাষ্ঠে অথবা তোপের দ্বারা নিহত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

সংখ্যা ৪৪৪ সন ১২৬২ সাল তারিখ ২০ কার্ত্তিক সোমবার ইংরাজী ৫ নবেম্বর ১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার।

সন্তালের পশুবৎ অসভ্য ও নিব্বীর্জ বটে এবং তাহারদিকের যুদ্ধ দ্রব্যাদি কিছুই নাই ইহা সকলি সত্য, তথাচ এই সামান্য বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল…ব্রিটিস পরাক্রমে তাহারা শঙ্কাও করে না, রুষীয় সমরসূত্রে এদেশীয় সমাচারপত্র সর্ব্বদাই তত্তৎ সংবাদের আন্দোলন হইতেছে এবং সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রে ও বিলাতীয় সংবাদপত্রে নানা বাদবিতণ্ডা চলিতেছে, কোন ২ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে সন্তালভয়ে কলিকাতাস্থ লোক পর্য্যন্ত কেহ ২ লিখিয়াছেন জনেক রুষীয় এজেণ্ট সন্তালদিগের পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন এবং টাইমস সম্পাদক সন্তালদিগের সাহসবার্ত্তায় লেখেন সন্তালদিগকে রণশিক্ষা দিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আনিলে তাহারদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে, যাহা হউক, সামান্য বিবেচনা করিতে ২ সন্তালীয় ব্যাপারে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

সংখ্যা ৪৫৯ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৭ আশ্বিন শনিবার, ইংরাজী ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫

সন্তালদলের গোলযোগের মূল শুন।

অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরক্ত না হইলে কেহ মহাবল রাজকুলে বিবাদানল প্রবল করে না, রাজারা প্রজারক্ষক, প্রজারা কি উৎকট কারণ ব্যতিরেকে মূৎস্বীকার করিয়া রাজ বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে পারে, তাহারা কি করে, রাজাই তাহারদিগের বিনাশ করিতে উঠিলেন সুতরাং তাহারাও প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজ বঙ্গে পতঙ্গের ন্যায় অঙ্গ ঢাকিতে আসিল। পর্ব্বতের দক্ষিনাংশবাসি সন্তালদিগকে রেলবোড কর্ম্মচারিরা একগুণে দশগুণ খাটাইলেন, তদুপযুক্ত বেতন দিলেন না, তাহারা চুক্তিমত উপযুক্ত বেতন চাহিল, রেলরোড কর্ম্মচারিগণ তাহারদিগের মারিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন এবং কেহ ২ যুবাকালাবস্থিতা সন্তাল কান্তাদিগকে বলাৎকার করিলেন ইহাতেই দক্ষিণাংশের সন্তালদল জাতক্রোধ হইয়া দলবদ্ধ হইতে লাগিল, এই এক কারণ।

পর্ব্বতের উত্তরাংশে পাহাড়তলিতে মধ্যে ২ অনেক ধান্যভূমি আছে তাহাতে উত্তম ধান্য হয়, সন্তালেরা পুরুষানুক্রমে ঐ সকল ভূমিতে ধান্য বুনিয়া সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, কোন পুরুষে ঐ সকল ভূমির রাজস্ব দেয় নাই, কালেক্টর বা ম্যাজিস্ত্রেট সাহেব দেখিলেন উর্ব্বর ভূম্যাধিকারে রাজকর নাই অতএব তিনি গবর্ণর কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন এ সকল ভূমির উপর কর নির্দ্ধারণ করিলে গবর্ণমেন্ট অধিক লভ্য দেখিবেন, এবং ঐ লোভাকুল রাজকুল তাহাতেই উত্তর লিখিলেন তুমি ঐ সকল ভূমির কর নির্দ্ধারণ কর কালেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পোলিস দারোগাকে লিখিলেন পাহাড়তলির কতভূমিতে ধান্য হয় তুমি তাহার পরিমাপ করিয়া লিখিবা, ঐ সকল ভূমির উপর কর নির্দ্ধারণ হইবেক, দারোগা পাহাড়তলির ধান্যভূমিতে যাইয়া রসারসী ফেলিয়া মাপ করিতে লাগিলেন সেই সময়ে উত্তরাংশীয় সন্তালেরা আসিয়া দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আমারদিগের ধান্যভূমিতে রসারসী ফেলিয়া কেন মাপ করিতেছ, দারোগা বলিলেন ইহার কর নির্দ্ধারিত হইবেক, সন্তালেরা কহিল আমরা কখন রাজস্ব দেই না এই সকল ভূমির ধান্য বিক্রয় করিয়া মদ ভাং খাইয়া পর্ব্বতের উপর বাস করি তোমাকে "কাড়মু" অর্থাৎ তোমার উপর তীর মারিব, দারোগা ভীত হইয়া বলিলেন তোরা যদি আমাকে তুষ্ট করিস তবে বিঘা এক আনা রাজস্বে তোদের ভোগে রাখিয়া দিব, সন্তালেরা কহিল যদি প্রতি বিঘা একআনা করিতে পারিস তবে টাকা দিব, তুই কি চাইস, দারোগা বলিলেন ১০০০ মুদ্রা তাহারা কহিল ভাল এক সহস্র মুদ্রাই দিব কিন্তু অগ্রে ৫০০ শত টাকা আর বিঘা ১ আনা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইলে আর পাঁচশত টাকা পাইবি, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ দারোগাকে ৫০০ শত টাকা দিল, দারোগা ঐ ৫০০ শত টাকা লইয়া থানায় গেলেন, এদিগে কালেক্টার কি মাজিস্ত্রেট

সাহেব ধান্যভূমিতে যাইয়া কোন বিঘা ৪ আনা কোন ৬ আনা হার নিৰ্দ্ধায্য করিলেন তাহাতেই কয়েকজন সন্তাল থানায় যাইয়া দারোগাকে কহিল তুই বলিয়াছিস্ প্রতি বিঘায় রাজকর ১ আনার অধিক লাগিবেক না তবে কেন সাহেব কোন বিঘা ৪ আনা কোন বিঘা ৬ আনা হার করে দারোগা ভীত হইয়া কহিলেন, কি করিব ভাই, সাহেব স্বয়ং আসিয়া কর নিৰ্দ্ধায্য করিতেছেন তাঁহার সাক্ষেতে আমার কোন কথা চলে না, সন্তালেরা কহিল, তবে যে আমাদের ৫০০ শত টাকা লইয়াছিস্ তাহা দে, দারোগা কহিলেন সে টাকা খাইয়া ফেলিয়াছি কোথায় পাইব, ভাই তোরা আমাকে ক্ষমা কর, ইহাতেই পৰ্ব্বতের উত্তর দিক বাশি সন্তালেরা ক্রোধাসক্ত হইয়া আপনারদিগের বাসায় গেল, ইহার পরে দক্ষিণ উত্তর উভয়দিকের সন্তলেরা একত্র হইল এবং মধ্যস্থলে যে সকল সন্তাল ছিল তাহারাও আসিয়া ঐ দুই দলের সহিত যোগ দিল এবং কেবল সহস্র ২ মনুষ্য নাশ হইল ইহা কি রাজার পাপ নহে প্রজারক্ষা করা কৰ্ত্তব্য।

দুই ···সংবাদ প্রভাকর···

।। সংকলন ।। ৩৯

৪ঠা শ্রাবণ, সন ১২৬২ সাল। ইং ১৯ জুলাই, ১৮৫৫

রাজমহলের পৰ্ব্বতীয় লোকদিগের অত্যাচার ভয়ানক হইয়াছে আমরা মুরশিদাবাদ ভাগলপুর ও আমড়ার রাজধানী হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা নিম্নভাগে লিখিলাম।

"ভাগলপুর ১ জুলাই।

সম্পাদক মহাশয়! ভাগলপুর, বীরভূম, রাজমহল, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জিলার পৰ্ব্বতবাসী অসভ্যলোক সকল একত্র দলবন্ধ হইয়া রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করাতে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবরা ভীত হইয়া একত্র বাস করিতেছেন, প্রজাদিগের ধনপ্রাণ রক্ষা করা দূরে থাকুক তাঁহারা আপনাপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছেন দুরাত্মারা যেখানে গমন করিতেছে সেইখানেই নিৰ্দ্দয়রূপে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার প্রাণ বিনাশ পূৰ্ব্বক সৰ্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্যন্ত দেশ তাহারদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা অন্যূন ষোল হাজার হইবেক, ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে এরূপ ঘটনা কোন কালেই হয় নাই, বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতিভয়ানক বলিতে হইবেক, সম্পাদক মহাশয় আজি হতসৰ্ব্বস্ব হইয়া ছিন্নবসন পরিধান পূৰ্ব্বক এক কৰ্ম্মকারের গৃহে বসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।"

"আমড়া ১৩ জুলাই।

সম্পাদক প্রবর! পর্ব্বত বাসিদিগের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, তাহার ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না, অনল দ্বারা গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিতেছে।…

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা যদ্যপি পর্ব্বতের উপর নাগরা ধ্বনি করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪/৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতি মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউক এই ঘটনায় গবর্ণ-মেণ্টের কোন ক্ষতি নাই যে ক্ষতি সে কেবল প্রজার। এই অত্যাচার ব্যাপারে… কি কারণে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই, কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় দুইজন বুজরুক ব্রিটীস অধিকার অপহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপূজা করিয়া তাহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে, রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল, যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।"

"বহরমপুর ১৪ জুলাই।

আমি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছি যে বিদ্রোহ কারিদিগের দমনার্থ এখান হইতে ৫০০ সোয়ার ও ৪০টা হাতি ও দুইটা তোপ গিয়াছে নবাব নাজিম ২০০ সিপাহী দিয়াছেন, তাহারা কোন কালেই সংগ্রামের মুখ দেখে নাই, অতএব এই অল্প সেনার দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের কোন সম্ভাবনা নাই, একারণ দানাপুরে পত্র গিয়াছে যে ঐ স্থান হইতে সেনারা জলপথ দিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইবেক কলিকাতা হইতেও রেইলওয়ের গাড়িতে সৈন্য আসিবেক, দুরাত্মারা দমন হইবেক বটে, কিন্তু তাহার-দিগের কোন বিশেষ হানি হইবেক না, পর্ব্বতের উপরে ভয়ানক শালবন আছে তাহারা তথায় গোপন হইলে রাজসেনারা তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না, সাঁওতাল জাতি অতি ভয়ানক, তাহারা যাহা পায় তাহাই আহার করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, তিরের যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ নিপুণ, আমারদিগের মাজিস্ট্রেট মেঃ টুগুড সাহেব অরঙ্গাবাদে অনরবিল মেঃ ইডেন্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ভাগল-পুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব তথায় আসিয়াছেন, সেনারা অরঙ্গাবাদ হইতে ঘটনাস্থানের নিকটবর্ত্তি হওয়াতেও দুরাত্মারা ভয় পায় নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে সাংগ্রামিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।"

৫ই শ্রাবণ, সন ১২৬২ সাল। ইং ২০ জুলাই, ১৮৫৫

…রাজমহল, ভাগলপুর, মুরসিদাবাদ, জঙ্গিপুর, অরঙ্গাবাদ, আমড়া, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরাজীপত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাদ্বারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে সাঁওতাল জাতিরা কোনকালে রাজ-বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহারা চিরকাল রাজানুগত ও পরিশ্রম তৎপর, তাহার দিগের পরিশ্রমে রাজমহলের পর্ব্বতোপরি বিচিত্র উদ্যান ও নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রচুর শষ্য উৎপন্ন করিতেছে, মেঃপটেণ্ট সাহেব যে সময়ে ঐ পর্ব্বতের রাজস্ব বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময়ে কেবল ৩০০ মাত্র সাঁওতাল জাতি তথায় বাস করিয়াছিল এইক্ষণে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইয়াছে এবং দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে সাঁওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় ভীরু স্বভাব নহে বলবান এবং সাহসিক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি নানা বিষয়ে অত্যাচার করাতে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

রেইলওয়ে কর্ম্মচারিগণ হুগলি ও বর্দ্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে আগেকার ভীরু স্বভাব লোকেরা কোন আপত্তি না করাতে তাঁহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা সহ্য করিবেক? আমরা অবগত হইলাম যে রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতির যুবতি স্ত্রীলোক-দিগকে ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাঁচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহাদিগের উদ্যান হইতে বলদ্বারা ফল কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই, সাঁওতাল লোক দিগকে পরিশ্রম করাইয়া-ছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবানজাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত তাহারা বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এ কথা কে বলিবেন?

৫২৯৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৯ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ২৪ জুলাই, ১৮৫৫

"মহেশপুরের যুদ্ধ।

আমরা রাজমহল হইতে গত দিবস যে কয়েকখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তত্তাবতেই মহেশপুরের ১৬ তারিখের যুদ্ধ বিবরণ লিখিত আছে, সাঁওতাল লোকেরা টাঙ্গি, ঢাল, তীর বরছা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্রাদি ফেলিয়া গিয়াছিল তাহা চারি পাঁচ গাড়ী হইবেক তাহারদিগের প্রায় তিনশত ব্যক্তি আঘাত হইয়াছে, আমরা সাহাবাজপুরের পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

সাহাবাজপুর, ১৮ জুলাই

সম্পাদক প্রবর, সাঁওতালদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে দুস্তার দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছি; প্রাণভয়েও কাতর আছি গত দিবস মেঃ সেণ্ট জর্জ সাহেব কতগুলীন লোক লইয়া এখানে আসিয়া সাঁওতাল লোকদিগকে আক্রমণ করেন, তাহাতে একপ্রকার সংগ্রাম হয়, বিপক্ষেরা শ্রাবণের ধারার ন্যায় তীর বর্ষণ করিতে থাকে, তদ্দৃষ্টে আমরা কম্পান্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু সেই তীর উক্ত সাহেবের অধীনস্থ লোকদিগের বিশেষ হানি কিছুই হয় নাই একটা তীর একজন সাহেবের ললাটে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা টুপির উপর পতিত হওয়াতে টুপিই উড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা বন্দুক ধরিয়া সাহসিকরূপে যুদ্ধ করাতে বিপক্ষেরা এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ফলতঃ জঙ্গলের পথ দিয়া অন্যদিকে বাহির হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেক তাহারা জঙ্গলাপথ সকল বিলক্ষণ জ্ঞাত আছে, ইংরাজ সেনাদিগের কি সাধ্য যে সেই জঙ্গলে প্রবেশপুর্ব্বক তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হয়, এক্ষণে ঐ জঙ্গলে যাইলে একপ্রকার জ্বর হয়, বিপক্ষেরা যখন রাজসেনাদিগকে দৃষ্টি করিয়াও ভীত হয় নাই সাহসিকরূপে অত্যাচার করিতেছে, যুদ্ধ সময়ে তীরাদি অস্ত্র চালনা করে তখন এই বিদ্রোহ শীঘ্র নিবারণ হয় এমত বোধ হয় না।"

৫৩০১ সংখ্যা, বুধবার ১৭ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ১ আগষ্ট ১৮৫৫

…মুরশিদাবাদ হইতে ২৩ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

সাঁওতাল জাতিরা অস্ত্র ধরিয়া মুরশিদাবাদের অতি নিকটে আসিয়াছে তাহারা শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জমীদারী বেলে ও মৃত্যুঞ্জয়পুর লুট করিয়াছে তাহাতে তাহারা অল্প সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ৫০ জন প্রজা হত হইয়াছে তাহারা উক্ত রাজাদিগের লাটঝুরি নামক তালুক আক্রমণার্থ আগমন করিতেছে এমত জনবর যে দুরাত্মারা রাজাদিগের কান্দিস্থ রাজবাটি আক্রমণ করিবেক। এই কথা যদ্যপি সত্য হয় তবেই সর্ব্বনাশ, প্রজাদিগের মহানিষ্ট হইবেক। রাজাদিগের ঠাকুর বাটিতে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজসে হীরামুক্তাদি খচিত দেবাভরণ স্বর্ণ খাট পালঙ্গ ইত্যাদি প্রায় ৭/৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আছে…

৫৩০৪ সংখ্যা, শনিবার ২০ শ্রাবণ, ১২৬২ সাল। ইং ৪ আগষ্ট ১৮৫৫

আমরা অবগত হইলাম যে অত্যাচারি সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায় তিন চারিশত লোক ধৃত হইয়াছে অনেকে হত ও আহত হইয়াছে মেঃ পনেট সাহেব একদল সৈন্য সহিত পর্ব্বতে উঠিয়া অত্যাচারিদিগের ঠাকুর বাটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাতেও

তাহারা ভীত হয় নাই, স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে প্রায় ৮০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া ভাগলপুর আক্রমণার্থ গমন করিয়াছিল কিন্তু সম্মুখে এক নদীতে তাহারা গভীর জল দেখিয়া ভাগলপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ঐ নদীতে নৌকাদি কিছুই ছিল না, এ কারণ তাহারা বীরভূমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

এতদ্দেশীয় কারাগার সমূহের তত্ত্বধায়ক মেঃ লচ সাহেব রাণীগঞ্জে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে ও পশ্চিম গমনের প্রশস্ত রাস্তায় সাঁওতাল দিগের অত্যাচার নিবারণের ভারগ্রহণ করিয়া গরুর গাড়ী ও মজুর লোকদিগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছেন শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের জামাতা আপনার অধীনস্থ গাড়ী সকলের চাকা খুলিয়া স্থানে স্থানে রক্ষাকরতঃ গো ও গাড়োয়ানদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া ছিলেন এই বিষয় মেঃ লচ সাহেব অবগত হইয়া তাঁহাকে বিধিমতে ভয়-প্রদর্শন করাইবাতে তিনি সাহায্য করণে সম্মত হইয়াছেন।

৫৩০৫ সংখ্যা, সোমবার ২২ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ৬ আগষ্ট ১৮৫৫

…এক ব্যক্তি সাঁওতালদিগের সুবার নিকট ছদ্মবেশে গিয়াছিল এ ব্যক্তি তিন-দিবস আহার করে নাই, সুবার বাটির নিকট উপস্থিত হইয়া সুবার দোহাই দেয় ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একটি টাকা দেন এবং কোন সাঁওতাল তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে তাহার সমভিব্যাহারে লোক দিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি কমিশনার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছে যে সুবা খেরুয়া বস্ত্রে পাদ্রীর ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করতঃ পরিধারণ করিয়াছেন, তিনি কাষ্ঠাসনে উপবেসন করেন, তাঁহার সম্মুখে রাশিকৃত টাকা, আধুলি ও পয়সা আছে, বোধহয় ঐ সকল টাকা লুটের টাকা……দুরাত্মারা দুইটা নীলকুঠীর সমুদয় দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে তাহারা প্রজাদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা বর্ণনা হয় না, অত্যাচারিদিগের সংখ্যা ৪০/৫০ হাজার হইবেক…চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে।

৫৩০৮ সংখ্যা, গুরুবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৫

মেঃ টুগুড সাহেবের পত্র

কাপ্তেন মিডেল্টন মেঃ এবং আমি কিছু নিজামতের সৈন্য লইয়া বেলা দেড়টার সময় ভগনাডিহিতে উত্তীর্ণ হইলাম সেখানেও লোক নাই। আমি কানুর বাটিতে প্রবেশ পূর্ব্বক সাঁওতালদিগের ঠাকুর পাইয়াছি, ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত চাকার ন্যায়, তাহার দুইস্থানে ছিদ্র আছে তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে। দুগ্ধ ঊর্দ্ধে গমন করে, ঐ ঠাকুরের আরও অনেক আশ্চর্য্য কথা নিকটস্থ

গ্রামের লোকদিগের মুখে শ্রবণ করিলাম। ঐ ঠাকুরের নিকট কয়েকটা ছাগ মুণ্ড ও দুইটা ষণ্ডের মুণ্ড ছিল। কানু পুজান্তে তাহা বলিদান করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল।...

তিন. ...সম্বাদ ভাস্কর...

॥ সংকলন ॥ ৪০

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, ১২৫ সংখ্যা

"...প্রকাশ হয় সন্তালেরা ২৩ দিবসে সুজারামপুরে মেঃ জি গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠী অধিকার করিয়া কাছারী আমলাদিগের বাসাবাটী সমুদয় গৃহ দাহ করিয়া দিয়াছে, ঐ কুঠীর কামরায় তাহারা একদিন অবস্থান করিয়াছিল, আমলারা পূর্ব্বেই তাঁহারদিগের আগমন সমাচার জ্ঞাত হইয়া গো মহিষাদি পশু ও কুঠীর কাগজাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, মেং গ্রাণ্ট সাহেব এক্ষণে কলকাতায় আছেন, ওদিগে সন্তালেরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল, এই সন্তালদল দেওঘরের দিক হইতে আসিয়াছে সুবা কর্ত্তা মাজি নামক এক ব্যক্তি তাহার দিগের দলপতি।..."

ঐ তারিখে, একই সংখ্যায় স্বীকার করা হয়েছে যে, সাঁওতাল যোদ্ধারা আরও দুর্বার হয়ে উঠেছে। পত্রিকার মতে; —"সন্তালেরা সমুদয় হন্দুই পরগণা ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র লুট করিতেছে, প্রথমবারাপেক্ষা এবারে বিদ্রোহানল আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রধান পক্ষের দোষেই এই বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইল, সন্তাল শাসন হইয়াছে বলিয়া সেনাসকল উঠাইয়া না আনিলে সন্তালেরা এরূপ দ্বিতীয়বার বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইত না।"

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬, ১২৯ সংখ্যা

"পাটনা নগরে জনরব উঠিয়াছে এবারে চারি লক্ষ সন্তাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, রাজসেনারা তাহারদিগের বেগধারণে অসমর্থ হইয়াছে, বেহারীয় যবনেরাই এই অমূলক জনরব তুলিয়াছে, তাহারা নিশ্চয় করিয়াছে সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সিংহাসন ভ্রষ্ট হইবেক।'

ঐ দিনই সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরও লেখা হলো ঃ—

"এক সন্তালীয় উপদ্রবেই গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, যদি এ সময়ে অন্য কোন দিগে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে একেবারে 'দেশ উচ্ছন্ন হইবেক, এ দেশে সৈন্যের বড়ই অঘটন পড়িয়াছে, রুষীয় সমরে গোরা পলটন সকল গমন করিয়াছে, সিপাহীদলের অধিকাংশ লাহেরাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং রাঙ্গুন পেগু

ইত্যাদি স্থানে রহিয়াছে, কলিকাতার নিকটে যে দুই একটি সিপাহি দল ছিল তাহারা সন্তাল তাড়নে নিযুক্ত আছে, এখন অন্য কোন বন্য জাতি বিদ্রোহি হইলে গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে তাহারদিগকে নিবারণ করিবেন দূর হইতে সেনা আসিতে ২ তাহারা সন্তালদিগের ন্যায় রাষ্ট্র বিপ্লব করিবে।"

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬

"৮ [ফিব্রুআরি] দিবসে একজন সন্তালের ফাঁসি দ্বারা প্রাণনাশ হয়, লেপ্টেনেন্ত টোলমিন সাহেবের হত্যা ব্যাপারে যে সন্তালেরা লিপ্ত ছিল এ ব্যক্তিও তাহারদিগের একজন সঙ্গী, এই সন্তালও ফাঁসীর আজ্ঞা শ্রবণে ভীত হয় নাই, ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিবার কালে তামাকু চাহিয়া খাইয়াছিল।

...বিদ্রোহি প্রদেশের যাবতীয় কামারেরা দিবারাত্রি বন্দুক নিৰ্ম্মাণ করিতেছে, বোধহয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে, তীর ধনুক টাঙ্গী লইয়া সিপাহি দিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারগ হয় না এইজন্যই সন্তালেরা বন্দুকের আয়োজন করিতেছে।...লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর গেলবারে বিদ্রোহি প্রদেশে যাইয়া সন্তালদিগের প্রশ্রয় বাড়াইয়া দিয়াছেন, তিনি বিদ্রোহি প্রদেশীয় পোলিসে সন্তাল বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সন্তালদিগকে এরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন যে তাহারা আপনাপন মোকদ্দমা যখন পঞ্চাইতের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবেক, ইহাতেই তাহারা আপনারদিগের স্বাধীন বোধ করিতেছে এবং স্বাধীনতা রক্ষা জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ করাইতেছে।"

২৫ নভেম্বর, ১৮৫৬

বীরভূম হইতে আগতপত্র

"মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সাঁওতালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, ঐ সকল সন্তালেরা যে দিবস ধৃত হয় সেদিনও তৎপর দিবারাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জলবিন্দুও পায় নাই, পোলিসের লোকেরা তাহারদিগকে যেমন ধৃত করিয়াছে অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খল যুক্ত করিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্তপদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে চৰ্ম্ম ছাড়িয়া গিয়াছে ঐরূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ

মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে, দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েক দিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে ২ পদাতিকেরা হেঁছড়ীয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া গেল পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই।…

সন্তালেরা আপনারদিগের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল সংগ্রাম সময়ে সভ্য জাতিরাও গ্রাম ২ দাহ করিয়া থাকেন, এবং বিপক্ষ পক্ষের অনুগত লোকদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লন, সন্তাল সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সন্তাল প্রজাদিগের গ্রাম দাহ অর্থ লুঠ করিয়াছেন, সন্তালেরা চুরী ডাকাইতী করে নাই, এক্ষণে তাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে,…

দামিনীকে স্থান হইতে যে ৫০ জন সন্তাল ধৃত হইয়া বীরভূম কারাগারে আসিয়াছে তাহারা জীবিতাবস্থায় আছে কিনা শ্রীযুত বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার তত্ব লইবেন, আমি জানিয়াছি গবর্ণমেণ্টের জেনেরেল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মতে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতেও কোন কোন বিষয় পাঠ করেন অতএব বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি আমার লিখিত এই প্রস্তাবটি যেন শ্রীল শ্রীযুত প্রধান পুরুষের কর্ণগোচর হয়।"

॥ সমীক্ষণ ॥

…প্রেক্ষিত…

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিদানে ভূমির ব্যক্তিমালিকানা ভারতীয় অর্থনীতিতে বিষম সংকট সৃষ্টি করে। জমিদারেরা ভূমির ব্যক্তিমালিক প্রতিপন্ন হয় এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংরক্ষণকারী হিসাবেই তাদের পরিচয়। বলাবাহুল্য, এই মাত্রা রাজনৈতিক অধস্তন গোষ্ঠী সৃজনে সহায়তা করে। ঔপনিবেশিক শক্তি সর্বদা অধীনতামূলক নীতির সূত্র মানে অথচ অধস্তন বণিক, মহাজন ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনেও আবদ্ধ থাকে। কারণ, এতেই তাদের লাভ। সম্পদ বাড়ে। মনে রাখা দরকার, অধস্তন গোষ্ঠীও সুযোগ সন্ধানী। সুযোগ সদ্ব্যবহারে এরা ছিল তৎপর। তাই দুই পক্ষের মিত্রতায় গভীর অর্থঘনতা ছিল। আর এই উভয় শক্তির শোষণসূত্রে কৃষকরাই বেশি পড়ে। সাঁওতালরা মূলত কৃষক। শ্রমের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে জমি। তাই শ্রমকিণাঙ্ক হাতে তারা ফসল ফলিয়েছে জীবনধারণের তাগিদে, সুখ-ঐশ্বর্য কামনায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় গ্রামসমাজ অঙ্গনের ওপর আঘাত এল। ভারতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ভাঙন স্পষ্ট হয়। লর্ড ডালহৌসী রাজ্যগ্রাস নীতি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিভূমিটাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে অসির ঝংকার তুলতে কসুর করেন নি। লেফটেনান্ট গভর্ণর ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাংলার বুকে ইংরেজ শাসকের শক্ত বনিয়াদ তৈরি করার জন্য অন্তহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সাঁওতালদের শোষণ ও শাসনাধিকারে আনার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন অনেক। সবলের সদম্ভ প্রকাশ, বিঘোষণ হয়েছে ঢের।

পূর্বেই গঠিত হয়েছে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ। ভাগলপুর হল একটি ডিভিশন। মিঃ অলিভার ছিলেন কমিশনার হিসাবে এর দায়িত্বে। তাঁরই অধীনে দামিন-ই-কোহর সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মিঃ জে. পন্টেট সাহেব। সাঁওতালরা তাঁকে পান্টিন বলেই ডাকতো। পন্টেটের দায়িত্ব ছিল খাজনা আদায়ের। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতো থানা-পুলিশ। দিঘি থানার দারোগা মহেশ দত্তও সাহায্য করতেন।

যে কুমারী মাটিকে সাঁওতালরা কর্ষিত করেছে, ফলবতী করে তুলেছে তার পবিত্রতা হরণ করেছে ইংরেজ। সুতরাং বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ছিল।[৪১] যাইহোক, শান্তিরক্ষার প্রস্তাবে কেবলমাত্র থানা পুলিশ নয়। আইন-আদালতও প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ফৌজদারী বিচার ও জঙ্গিপুর মুন্সেফে দেওয়ানি বিচার শুরু হয়। ব্যবস্থা ছিল। শুধু সুবিচার ছিল না। তাই সাঁওতালরা বুঝে উঠতে পারেনি ;—

১. জীবনধারণের জন্য যে বন কেটে তারা শস্য ফলায়, তার জন্য তাদের খাজনা দিতে হবে কেন ? আর যদি দিতেই হয় শ্রমের কড়ি, তবে তার হার এত অতিমাত্রিক বা কেন ?

২. জমিদার, মহাজন কেনই বা তাদের পীড়ন-তাড়ন করে ? কেনই বা তাদের অনাহার। কিংবা কর্জ নিতে হয় ?

৩. আইন-আদালত, থানা পুলিশ থাকতে কেনই বা তারা নিষ্পেষিত হবে ? পুলিশ কেন অন্যায় জুলুম করে। মহাজন কেন তাদের সম্পত্তি ক্রোক করে। আজন্ম খেটে, দাসত্ব করেও মহাজনের ঋণ চক্র থেকে মুক্তি নেই ? দিকু মহাজন, সরকারি কর্মচারি, রাজপুরুষরা কেনই বা তাদের ঘরের মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয়, বে-ইজ্জতি করে ?

এসব ইত্যাকার প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। অসন্তোষের মাত্রা বাড়ে। একসময় তাদের মনে মুক্তির-আকাঙ্ক্ষাও জাগে। তার জন্য চলে যুদ্ধের ক্ষেত্র-প্রস্তুতি।

সরলমানুষ এরা, নিরক্ষর। আর তাদের সরলতার সুযোগ নিত মহাজন, ব্যবসায়ীরা। সাঁওতাল গ্রামের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে গ্রামে ঢুকল দোকান খুলে বসল, চুড়ি, রঙিন কাপড়-চোপড়, চোখ ধাঁধানো জৌলুষ বাহারী জিনিসপত্রের। আর খুলল মদের দোকান। তারা এসব ধারেও দিত। মদ আর মনোহারি দ্রব্যাদি বাবদ দেনায় তারা সর্বস্বান্ত হতো। কারস্টেয়ার্স সাহেব তাঁর 'হারমাজ ভিলেজ' গ্রন্থে এসব বলেছেন গল্পের আঙ্গিকে।[৪২]

'ক্যালকাটা রিভিউ'[৪৩] উদাহরণ সহযোগে সাঁওতালদের গণঅসন্তোষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে। যে সাঁওতাল যৌবনে মহাজনের নাম শোনেনি, ঋণের কথা কল্পনাও করেনি। পরিবর্তিত অবস্থায় চাষের জন্য কিংবা হঠাৎ কিছু অর্থের প্রয়োজন হল, তখন মহাজন বলদেও সিং হাজির হয়ে চার টাকা ধার দিল, সুদ পঁচিশ টাকা। কিংবা হলধর চৌধুরী ছ'টাকা ধার দিয়ে বুঝে নিল তেরটাকা। কিন্তু কেউ কোনো রসিদ দিল না। কেন বেশি নিল তাও বলল না। আবার হয়তো মহাজন মানিক চৌধুরীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান বা শোকানুষ্ঠান তাতে তার বাড়তি অর্থ চাই। তখন সে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে একশত টাকা সেলামি চেয়ে পাঠায়। চাওয়া তো নয়, জুলুম আদায় শুরু হয়। মহাজনের তাগিদটাই বড়, হুকুমটাই শেষ কথা। তাই টাকা দিতে না পার শস্য দাও। শস্য নিতে স্বয়ং মহাজন গরুর গাড়ী নিয়ে হাজির হতো। তারা সাঁওতাল কুলি নিত। অথচ মজুরি নগদ নেই। আরো আছে। গঙ্গাধর প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর সীমানা মানিক সাঁওতালের গৃহস্পর্শ করেছে। অতএব কর চাই। মানিক স্বীকার করে নেয়। চুক্তি হয় ছ'আনা। কিন্তু জমিদারের গোমস্তা উসুল করে ছ' টাকা।

রাজস্বক্ষেত্রে খাজনার ক্ষেত্রে অরাজকতা আরও ভয়ানক। নায়েব, সেজোয়ালদের দায়িত্ব ছিল পরগণাইত ও মাঝিদের কাছ থেকে গ্রামবাবদ খাজনা নেওয়ার। খাজনার

কথা হয়তো ছ'টাকা। কিন্তু তারা ছ'টাকা আরও বাড়তি দাবি করল। গ্রামে যখন এসেছে উপরিটা দিতে হবে। কিছু না পার, বাঁশ দাও বেড়া বাঁধার কাজে লাগবে।

সাঁওতালরা কেন ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল, সেই প্রসঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক বিড়ম্বনার* কথা স্মরণ রাখতে হবে পূর্বাভাসিত তথ্য হিসাবে। ইংরেজ লেখকরাও এসব তথ্য স্বীকার করেছেন অনেকখানিক। জনৈক লেখক তাঁর 'দি স্টোরি অব দ্য সান্তাল' গ্রন্থে এসব কথা বলেছেন তালটাণ্ডিমানুষের দুঃখ প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন এখানকার মানুষ প্রতিবর্গফুট জমি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে আবাদযোগ্য করেছে অথচ এর সুফল জমিদার ভোগ করবে; এটা অন্যায় বলেই সাঁওতালরা মনে করত। এরা শত্রু।[৪৪]

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শত্রুর পিছনে ছিল বড় শত্রু। তারা ইংরেজ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল জনজাগরণ, সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণার পেছনে ছিল স্বাধীনতার অন্তিম লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যেই ছিল একটি জাতির পক্ষে সমস্ত মানুষের সম্মিলন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ফল যা হবার তাই হল। অসমযুদ্ধে গণ মৃত্যুই হল। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে ইতিহাসের দিকে। ভারতের প্রায় শতবর্ষের বিদ্রোহক্ষুব্ধ জনচেতনার ইতিহাস আমাদের জানা আছে, কিন্তু কোনোটাতেই ব্যাপক মানুষের আত্মসচেতনতা, অংশগ্রহণ ও আত্মবলিদানের নজির মেলে না। সে ইতিহাস আরও পরের। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। আর, এই অসম যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে মেজর ভিনসেণ্ট জার্ভিস ব্যক্তিগত স্মৃতিকথায় বলেছেন অনেক কিছু। তাঁর কথন-চিত্র থেকে আমরা তিনটি বাক্য সাজাতে পারি।[৪৫]

১. যুদ্ধ নয়। আমরা (ইংরেজরা) যা করেছি, তা হত্যা।
২. না যুদ্ধ নয়। তারা (সাঁওতালরা) আত্মসমর্পণ করতে জানে না।
৩. এই যুদ্ধে একজনও সিপাহী ছিল না যে তার কাজের জন্য লজ্জিত নয়।

॥ ১ ॥

…বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া : স্ব-বিরোধিতা, ঔদার্য…

'সমাচার সুধাবর্ষণ' ও 'সংবাদ প্রভাকর'—পত্রিকা দুটিতে যেসব সংবাদ মেলে তার থেকে এরকম ধারণা অস্বাভাবিক নয় যে, সাঁওতালদের বিদ্রোহক্ষুব্ধ হওয়ার সঙ্গত কোনো কারণ ছিল না। তারা অযথা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। এবং তাদের হিংস্রতার জন্য সংগঠিত হয়েছে বহু নারকীয় ঘটনা। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি ছিল অন্যরকম। সাঁওতালদের অত্যাচার বিষয়ক অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করেই সম্পাদকদ্বয় ক্ষান্ত হননি। সরকারকে নানারকম দমনমূলক পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাই তাঁরা লিখতে পারলেন দুর্মুখ ভাষ্য। প্রভাকর লিখল, সাঁওতালদের নির্দয় অত্যাচারে প্রজারা "ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে।" শ্যামাচরণ সেন 'সমাচার সুধা-

বর্ষণ-এ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করে "সন্তালকুলের সর্বনাশ হউক" কামনা করেছেন। কারণ তাঁর "সন্তালীয় সমাচার লিখিতে ২ লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল তথাচ এ পাপ গোল নিবারণ হইল না, বরং দিন ২ বৃদ্ধি পাইতেছে।" (১৪.৭.১২৬২)

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্করও একই মনোভাব পোষণ করতেন। তবে এটা লক্ষণীয়। সম্পাদকদের মধ্যে স্ববিরোধিতাও ছিল। এসব পত্রিকার সম্পাদকরা সাঁওতালদের এত শাপ-শাপান্ত করেছেন অথচ কখনও কখনও মূল ধরার চেষ্টা করেছেন, গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রভাকর ১৮৫৫ সালের ২০ জুলাই সংখ্যায় লিখেছে যে, সাঁওতালদের ওপর রাজস্বের চাপ, রেলওয়ে কর্মচারীর অত্যাচার, স্ত্রীলোকদের ওপর বলাৎকার, মূল্য না দিয়ে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি হরণ প্রভৃতি "বলবান জাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন?...তাহারা বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে এ কথা কে বলিবেন?" প্রভাকর বিশেষ তদন্তের দাবি জানায়। ১৮৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-ও একই প্রতিধ্বনি করে।

'সম্বাদ ভাস্কর'-এ এক পত্র লেখক খোলাখুলি স্বীকার করলেন, "সন্তালেরা আপনারদিগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল...।" ২৫.১১.১৮৫৫ তারিখে বীরভূম থেকে আগত পত্র খানিতে লেখকের সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি ও মর্মবেদনা ধরা পড়ে। উল্লেখ্য, সম্পাদকের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা না থাকলে এ জাতীয় পত্র ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে না।

সেদিনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কৃষিকেন্দ্রিক অভ্যুত্থানগুলি সুনজরে দেখতে পারেননি। না পারারও কারণ ছিল। তখন তাঁদের জীবনধারা ছিল মুৎসুদ্দীগিরি জীবনধারা। এ ছাড়া মধ্যবিত্তসুলভ আড়ষ্টতা তো ছিলই। ইংরেজের অগ্রপ্রসারের ইতিবাচক দিক ও সুফল তাঁরা লাভ করেছেন। ফলে ইংরেজ তোষণ তাঁদের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

আবার এটাও ঠিক। কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষ সাঁওতালদের মর্মযন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে ঔদার্য লক্ষ্য করা যায়। হরিশচন্দ্র তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর পাতায় বলেছেন, সাঁওতালরা শান্তিপ্রিয়, সরল। এদের প্রতি অন্যায়, অবিচার করা হয়েছে। রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মচারিদের অত্যাচার, বেগার খাটানো, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ, বে-ইজ্জতি ঘটনার প্রভৃতি কারণে তারা বিদ্রোহের পথে গেছে। তিনি মনে করেন, তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শান্তিতে বাস করতে চেয়েছিল। এই শান্তিপূর্ণ বাঁচার তাগিদে তাদের এই জাগরণ, অভ্যুত্থান। তাই সরকারের প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল, সাঁওতালদের শাস্তি দেওয়ার চেয়ে মূল ধরে নাড়া দিতে হবে; ক্ষমার অযোগ্যদের কেবল শাস্তি দেওয়া উচিত।[৪৬]

হরিশচন্দ্র সাঁওতালদের অবস্থা অনুধাবন করেছিলেন যথার্থ। তবুও তিনি

বলেছেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহীরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেভাবে ধ্বংস ও লুণ্ঠনের নেশায় মেতেছে, তার প্রতিরোধ করতে হলে, সরকারকে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেই দমন করতে হবে ; না হলে বিষয়টি জটিল হবে। এই ধরণের মন্তব্যের মধ্যেও সেই স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করি। তবে তিনি যুক্তিবাদী, উদার দৃষ্টি সম্পন্ন বলে এবং সেদিনের রাজনৈতিক আবর্তে যতখানি বলা সম্ভব, বলেছেন। তাই 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' যখন বিদ্রোহীদের পেগু পাঠাবার প্রস্তাব দেয়; তা তিনি সমর্থন করেন নি।[৪৭] এটি তাঁর মুক্তবোধের পরিচায়ক।

আর এক শিক্ষিত বাঙালী কাশীপ্রসাদ ঘোষ তিনিও উদার মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সাঁওতালদের ক্ষোভের কারণগুলি সমর্থন জানান। তিনি সাঁওতালদের বিদ্রোহকে সংগঠিত অথবা রাজনৈতিক অপরাধ বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে, যেভাবে সাঁওতালরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত হয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে সরলমতি সাঁওতালরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় এই গোল বাঁধে।[৪৮]

এই প্রসঙ্গে একটি পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করি। ১৮৯৫-৯৬ সালে দিগম্বর চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত পাণ্ডুলিপি 'History of the Santal Hool of 1855' এ যাবৎ অমুদ্রিত অবস্থায় বাক্সবন্দী ছিল। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় অরুণচৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি আলোকে এল।

দিগম্বর চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৪৯ এবং মৃত্যু হয় ১৯১৩ সালে। পেশায় প্রথমে শিক্ষক ও পরে আইনজীবী হন সাঁওতাল পরগণায়। পাকুড় রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে যায় সাঁওতালদের গণযুদ্ধ। আইনজ্ঞ হিসাবে যৌবনে ব্রাত্যজন ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দরদভরাতুর মন-ই তাঁকে গভীর অন্বেষণে ঠেলে দেয়। ফলে তিনি বঞ্চিত কৃষকদের তথ্য রোজনামচা, আকারে লিখে রাখেন। সিদুকানুর পিতা ও আত্মীয় বর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অত্যাচারী দীন-দয়ালের বোন বিমলা দেবীর কাছ থেকেও তথ্যসংগ্রহ করেন। তিনি রচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে 'Oral method' অনুসরণ করেন। মৌখিক ইতিহাসের মূল্য অপরিসীম। এখানে পুঁথি নির্ভর রেকর্ডস নেই বটে তবে অনুসন্ধান মূলক তথ্যাদি ইতিহাসের ধারাকেই পুষ্ট করেছে নিকষিত হেমের মতই।

সমকালীন পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিউ' সাঁওতালদের ক্ষোভের কারণ কিছু কিঞ্চিৎ তুলে ধরেছে। শোষণের চিত্র নিয়ে আলোচনা করেছে। অবশ্য স্ব-জাতি-প্রাণতার জন্য নিষ্ঠুর রাজকাহিনী এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ব্রিটিশ রাজনীতি আশ্রিত ও পুষ্ট।

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালীর চিন্তা ও চৈতন্যের নব উন্মেষ সুবাদেই বাংলায় নবযুগ বলা হয়ে থাকে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মহাবিদ্রোহের কাল (১৮৫৭) পর্যন্ত,—এই পরিধিতে অনেক আন্দোলন, অনেক সংস্কার ও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৮১৭-১৮৫৭-এই চল্লিশ বৎসরে বাঙালী সমাজের তিনটি স্তরের অতিক্রান্তী নবযুগ ও মহাপর্ব বিশেষ। ১. রামমোহনের কাল (১৮১৭-১৮৩১); ২. ইয়ং বেঙ্গলের কাল; (১৮৩১-১৮৪৩); এবং তত্ত্ববোধিনীর কাল (১৮৪৩-১৮৫৭) অর্থাৎ এই সময় কালে বাঙালী সমাজে শিক্ষাদীক্ষা দুপুরুষের। গোপাল হালদার সে কথাই বলেছেন।[৪৯] বিনয় ঘোষের মতে তিনপুরুষের। ১. বয়ীয়ানদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামমোহন এই কালের প্রধান পুরুষ। ২. মধ্যবয়স্কদের মধ্যে ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' ও 'তত্ত্ব বোধিনী' কালের কর্মিষ্ঠ পুরুষ। ৩. রাজনারায়ণ বসু মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন হিন্দু কলেজের সদ্যশিক্ষিত এবং তাঁদের অনুজ দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ।[৫০] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে। সমাজ সচেতন এত সব অগ্রণী পুরুষ থাকতে এই সময়ের কৃষক বিদ্রোহগুলি তাঁদের আলোড়িত করেনি কেন? তার কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশ জমিতে মধ্যস্বত্ব ভোগী। তার ওপর ইউরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতি আত্মস্থ করে কোম্পানির আস্থাভাজন মুৎসুদ্দি হলেন ফলে তাঁদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, চিন্তাধারা ও কর্মসূত্রে গোঁজামিল ছিল বেশি। নেপাল মজুমদার বলেছেন, "সেদিন না ছিল তাঁহাদের দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ, না ছিল তাঁহাদের চেতনা ও মানসিক প্রস্তুতি। তাই তাঁহাদের জীবনাদর্শনে ও আচরণে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ সংস্কারবাদ ও বিপ্লববাদের এত তাত্ত্বিক গোঁজামিল; তাই তাঁহাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে এতখানি দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়তা ও স্ববিরোধিতা।"[৫১] আর; পূর্ব সংস্কার তো ছিলই। অতীতে হিন্দু কৃষক প্রজা কুলাচার নিয়ে ব্যস্ত ও নির্বিবাদী ছিল। তাই ভূস্বামী ও রাজন্যের অত্যাচার নিয়তি নির্দিষ্ট মনে করতো আর এরজন্য ঈশ্বরের দণ্ড অত্যাচারীর ওপর নেমে আসবেই; এই ছিল তাদের অন্তরতম বিশ্বাস। কেননা তারা মনে করতো রাজধর্মে সাধারণের অধিকার নেই চর্চার ও প্রতিবিধানের। এই মানসিকতার উত্তরাধিকার ছিল নবযুগের বুদ্ধিজীবীদের; সেকথা সমান উল্লেখ্যতার দাবি রাখে।

॥ ২ ॥

…সাঁওতাল যোদ্ধা : দণ্ডিত বন্দী…

সরকারি আদেশনামা ৩৪০০, তারিখ ৩.১২.১৮৫৫

বীরভূম জেলার সেসনজজ কর্তৃক দণ্ডিত ২২ জন সাঁওতাল যোদ্ধার বিবরণ। এদের বীরভূম থেকে হাজারিবাগ জেলে প্রেরণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগের জন্য।

প্রথম তালিকা ॥ ক ॥

সংখ্যা	অপরাধীর নাম :	অপরাধ :	দণ্ডদান : ও তারিখ	দণ্ডিত বন্দীর বিবরণ (বয়স দৈহিক বিবরণ ও নিবাস)
১.	সিংরায় মাঝি পিতা-মেঘর	অবৈধ জমায়েত, দাঙ্গা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হত্যার চেষ্টা, শান্তি ভঙ্গের অপরাধে ধৃত।	৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ১২.১১.১৮৫৫	বয়স ২৯। কৃষ্ণবর্ণ, নাক চ্যাপ্টা। বাঁ-হাতে ৪-টি পোড়ার দাগ। ডান হাতে টিকার চিহ্ন। পিঠের ডানদিকে আলসারের চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৭"। সাঁওতাল। বীরভূম জেলার নানগুলিয়া থানার আসনা গ্রামে নিবাস।
২.	নফর পাল (কুমার) পিতা-মুচিরাম	ঐ	ঐ	বয়স ৪৯। কৃষ্ণবর্ণ। দুহাতে টিকার চিহ্ন। পেটে জরুল। বাঁ-পায়ে ঘা। উচ্চতা ৫'-২"। কুমার। নিবাস-আসনা
৩.	শ্যাম মাল পাহাড়িয়া পিতা-রূপনারায়ণ	দাঙ্গা, লুণ্ঠন অপরাধে ধৃত।	ঐ	বয়স ৩৭। শ্যামবর্ণ। শরীরে তিল। গায়ে বড়শি-গাঁথার দাগ। ডান পায়ের আঙুলে ক্ষত। উচ্চতা ৫'-২"। পাহাড়িয়া মাল। নিবাস-সণ্ডা
৪.	পরেশমাঝি পিতা-কেতু	অবৈধ জমায়েত, দাঙ্গা, মারাত্মক অস্ত্রাদি নিয়ে সম্পত্তি লুণ্ঠন অপরাধে ধৃত।	১ বছর কঠোর সাজা। ২৫ টাকা জরিমানা ১৪.১১.১৮৫৫	বয়স ১৬। কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক। বাঁ-হাতে ২টি পোড়া চিহ্ন। কান ফুটো। উচ্চতা ৫'। সাঁওতাল। বীরভূম জেলার নানগুলিয়া থানার ম্যাসাঞ্জোরে নিবাস।

৫.	চন্দ্রমাঝি পিতা-মঙ্গলা	ঐ	ঐ	বয়স ১৮, কৃষ্ণবর্ণ। নাক চ্যাপ্টা। বাঁ-হাতে ৩টি পোড়া দাগ। পিঠে কালো চিহ্ন। উচ্চতা—৫´। সাঁওতাল। নিবাস—ঐ
৬.	সালকো মাঝি পিতা-গোরা	ঐ	৩-বছর সাজা ১০০ টাকা জরিমানা ১৪.১১.১৮৫৫	বয়স ৩১। শ্যামবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক। বাঁ হাতে ৪টি পোড়া দাগ। ডান হাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫´-৩″। সাঁওতাল, নিবাস—ঐ
৭.	সিংরায় মাঝি পিতা-কুমার	অবৈধজমায়েত দাঙ্গা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বীরভূম জেলার কাতনা গ্রাম লুণ্ঠন	৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ১৭.১১.১৮৫৫	বয়স ৪০। শ্যামবর্ণ, বুকের নিচে আলসারের চিহ্ন। বাঁ-হাতে ৩টি পোড়া দাগ। উচ্চতা ৫´-৪″। সাঁওতাল। কাতনা গ্রামের বাসিন্দা।
৮.	কাণ্ডন মাঝি পিতা-কুম্ভীর	ঐ	ঐ	বয়স ৩৫। শ্যামবর্ণ বাঁ-হাতে ৭টি পোড়া দাগ। ডানহাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫´-৫″। সাঁওতাল। আফজলপুর থানার তেলু-বনি গ্রামে নিবাস
৯.	লক্ষ্মণ মাঝি পিতা-গোবিন্দ		ঐ	বয়স ৩৮। শ্যামবর্ণ, চওড়া কপাল। বাঁ-হাতে ৪টি পোড়া দাগ। ডান হাতে টিকার চিহ্ন। ডান-পায়ের দুটি আঙুল বাঁকা। উচ্চতা ৫´-৬″ সাঁওতাল। নিবাস—ঐ
১০.	কালুমাঝি পিতা-রাম	ঐ	ঐ	বয়স ৪৫। শ্যামবর্ণ, চওড়া কপাল। চ্যাপ্টা নাক। বাঁ হাতে ৩-টি টিকার চিহ্ন। পিঠের ডানদিকে ঘায়ের দাগ। উচ্চতা ৪´-১১″ সাঁওতাল। নিবাস—ঐ

১১.	ধানরা মাঝি পিতা-খুদিমাঝি	ঐ	ঐ	বয়স ৩৭। কৃষ্ণবর্ণ, বাঁ-হাতে ৩-টি পোড়ার দাগ। ডান-হাতে টিকার চিহ্ন। পিঠে বহু ঘায়ের দাগ। উচ্চতা ৫'-৬"। সাঁওতাল আফজলপুর থানা অন্তর্গত লেলিবনা গ্রামে নিবাস।
১২.	রুরু মাঝি পিতা-বাম	ঐ	ঐ	বয়স ২৯। কৃষ্ণবর্ণ, বাঁ-হাতে পোড়ার দাগ ও টিকার দাগ মোট ৩টি, পিঠে একটি পোড়ার দাগ। উচ্চতা ৫'। সাঁওতাল। নিবাস-জেলাবাদ।
১৩.	মোটা মাঝি পিতা-কাদ	ঐ	ঐ	বয়স ৪১। কৃষ্ণবর্ণ। বাঁ-হাতে ৪টি পোড়ার দাগ। ডানহাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫', সাঁওতাল। থানা আফজলপুর গ্রাম সিউবনাতে নিবাস
১৪.	বাগদু মাঝি পিতা-বুনার	অবৈধ জমায়েত দাঙ্গা হাঙ্গামা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাতনা গ্রাম লুণ্ঠন	৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ১৭.১১.১৮৫৫	বয়স ৩৯। কৃষ্ণবর্ণ চ্যাপ্টা নাক, কানফুটো গায়ে দাদ, বাঁ-হাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫', সাঁওতাল। আফজলপুর থানার খেজুড়ি গ্রামে নিবাস
১৫.	বিশু মাঝি পিতা-গম্ভীর	ঐ	ঐ	বয়স ৩৬। শ্যামবর্ণ, পিঠের বাঁ-দিকে আলসারের চিহ্ন। বাঁ-হাতে ৩টি পোড়া দাগ, ডান হাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৭", সাঁওতাল। আফজলপুর থানার তেলা-বাদের নিবাসী
১৬.	কুড়া মাঝি পিতা-চম্পাই	ঐ	ঐ	বয়স ২৮। কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক। বাঁ-হাতে ৩-টি পোড়া দাগ। ডান হাতে টিকার

				চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-২" সাঁওতাল। নিবাস বাগিংগা, থানা আফজলপুর।
১৭.	রাজ মাঝি পিতা-চতুরা	ঐ	ঐ	বয়স ৩৪। কৃষ্ণবর্ণ। কানফুটো। বাঁ-হাতে ৪টি পোড়া দাগ। বাঁ-কাঁধে আলসারের চিহ্ন। সাঁওতাল। নিবাস—বাগিংগা।
১৮.	দোলেল মাঝি পিতা-মানসিং	ঐ	ঐ	বয়স ৫৬। শ্যামবর্ণ, কানফুটো। দুই হাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৪", সাঁওতাল। থানা—নলহাটি, গ্রাম—কোটানোবেড়িয়া-তে নিবাস।
১৯.	শীতল মাঝি পিতা-বীরসিং	ঐ	ঐ	বয়স ১৫। কৃষ্ণবর্ণ, নাক ছোট, কান ফুটো। বাঁ-হাতে ৫টি টিকার দাগ। উচ্চতা ৪'-১০" সাঁওতাল। নিবাস-কোটানোবেড়িয়া।
২০.	বীরসিং মাঝি পিতা-শ্যাম	ঐ	ঐ	বয়স ৪৫। শ্যামবর্ণ। বাঁ-হাতে ৪টি টিকার দাগ। ডান হাতে ১টি। উচ্চতা-৫'-১১"। সাঁওতাল। নিবাস—ঐ
২১.	কুতোর মাঝি পিতা-মেঘরায়	ঐ	ঐ	বয়স ৩৫। শ্যামবর্ণ, পেটে আলসারের চিহ্ন। দুই হাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৩" সাঁওতাল। নিবাস—সুবারপুর, থানা, নলহাটি, জেলা বীরভূম।
২২.	রমন মাঝি পিতা-চিনু	ঐ	ঐ	বয়স ৩০। কৃষ্ণবর্ণ, ছোট নাক। বাঁ-হাতে ৫টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৩" সাঁওতাল। নিবাস—গোরিয়াপানি, থানা—নলহাটি, জেলা-বীরভূম।

...সাঁওতাল যোদ্ধা : দণ্ডিত বন্দী...

সরকারী আদেশ নামা ৩৪০০, তারিখ ৩.১২.১৮৫৫

বীরভূম জেলার সেসন জজ কর্তৃক দণ্ডিত ২০ জন সাঁওতাল যোদ্ধার বিবরণ। এদের বীরভূম থেকে বাঁকুড়া জেলে প্রেরণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগের জন্য।

দ্বিতীয় তালিকা ॥ খ ॥

সংখ্যা	অপরাধীর নাম	অপরাধ	দণ্ডদান ও তারিখ	দণ্ডিত বন্দীর বিবরণ (বয়স, দৈহিক বিবরণ ও নিবাস)
১.	জগমনাই পিতা-রঞ্জিৎ	অবৈধজমায়েত দাঙ্গা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হত্যার চেষ্টা শান্তিভঙ্গের অপরাধে ধৃত।	৩ বছর সাজা, ১০০ টাকা জরিমানা ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৬০। কৃষ্ণ বর্ণ। পাকাচুল। পেটের নিচে জড়ুল, বাঁ-হাতে ৪টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৫', সাঁওতাল। নলহাটি থানার গোরিয়াপানি গ্রামে নিবাস।
২.	দুলুভ পিতা-কানু	ঐ	ঐ	বয়স ৩৮। শ্যামবর্ণ, খোলাকান। পাকাচুল বাঁ-হাতে ৫টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৫", সাঁওতাল। নিবাস—গোরিয়াপানি।
৩.	বিশু নেউই পিতা-সুখ	ঐ	৬ বছর সশ্রম সাজা, ৯.১১.১৮৫৫	বয়স৩৮। কৃষ্ণবর্ণ, খোলাকান। বাঁ-হাতে ৩টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৩", সাঁওতাল নিবাস—ঐ
৪.	সাজোর পর্চ মুছেক পিতা-সিধ	ঐ	৩-বছর সাজা ও ১০০ টাকা জরিমানা ৯.১১.১৮৫৫	উল্লেখ নেই।
৫.	দীনু মনাই পিতা—উল্লেখ নেই	ঐ	৫-বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ২৩। শ্যামবর্ণ। ছোট নাক। বগলের বাঁ দিকে পোড়া দাগ। বাঁ-হাতে ২টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৩", কামার। নিবাস—গোরিয়াপানি।

৬.	বলরাম মঝি পিতা-মংলি	ঐ	৩-বছর দণ্ড ১০০ টাকা জরিমানা ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ১৬। শ্যামবর্ণ বাঁ-হাতে ৬টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
৭.	মুরিয়া মঝি পিতা-নিমাই	ঐ	ঐ	বয়স ১৫। কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক। বাঁ-হাতে ৫টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৫'-১"। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ।
৮.	চণ্ডী মঝি পিতা-নিমাই	ঐ	৫-বছর ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৪৬। শ্যামবর্ণ। কান ফুটো। বাঁ-হাতে ৪-টি টিকা। ৫'-৭", সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
৯.	রঞ্জিৎ মঝি পিতা-ইঙ্গু	ঐ	ঐ	বয়স ২৭। ছোট নাক। বাঁ হাতের ৫টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৫'-৫"। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
১০.	মংলি মঝি পিতা-ছিদাম	ঐ	ঐ	বয়স ৪০। বাঁ-হাতে * ৬টি ও ডানহাতে ১টি টিকার চিহ্ন উচ্চতা ৫', সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
১১.	সোনা মঝি পিতা-দোনা	ঐ	ঐ	বয়স ১৬। শ্যামবর্ণ। খোলাকান। বাঁ-হাতে টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-২"। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
১২.	গোপাল মোরে পিতা-পরাণ	ঐ	৩ বছর সশ্রম দণ্ড ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৬০। শ্যামবর্ণ। পাকাচুল, ফুটোকান বাঁ হাতে ৪টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। পিঠে আঁচিল। উচ্চতা ৫'-৫"। কুমার। নিবাস—ঐ।

* পাঠক লক্ষ্য করবেন, সেকালেও প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

১৩.	সূর্য মাঝি পিতা-লক্ষ্মণ		৫ বছর সশ্রম দণ্ড ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৩৩। কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক। বাঁ-হাতে ৫টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৫'-৫" সাঁওতাল নিবাস ঐ
১৪.	নিমাই মাঝি পিতা-শংকু	ঐ	ঐ	বয়স ৩১। কৃষ্ণবর্ণ, ফুটো-কান। বাঁ হাতে ৬টি ও ডান হাতে ২টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-৪"। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
১৫.	মঙ্গু মাঝি পিতা-তংখু	ঐ	ঐ	বয়স ৩৪। কৃষ্ণবর্ণ, কান ফুটো। বাঁ-হাতে ৬টি ও ডান হাতে ২টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৫'-৪"। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
১৬.	শ্যাম মাঝি পিতা-শীনু	ঐ	ঐ	বয়স ৩৬। শ্যামবর্ণ, কান-ফুটো। বাঁ-হাতে ৩টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৫'-৪"। সাঁওতাল নিবাস-ঐ
১৭.	মেঘ রায় * পিতা-হাংরা	ঐ	৬ বছর সশ্রম দণ্ড ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৬০। শ্যামবর্ণ, নাক ও কান ফুটো বাঁ-হাতে ৪টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। ৫'-৫" উচ্চতা। সাঁওতাল। নিবাস-ঐ
১৮.	দমন মাঝি পিতা-প্রস্তেন	ঐ	৩ বছর সশ্রম দণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৫৮। শ্যামবর্ণ, কান ফুটো। বাঁ-হাতে ৪টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা ৫'-১"। সাঁওতাল। নিবাস—নলহাটি থানার সুবুরপুর

* বন্দীতালিকা তৈরি করেছিলেন এ. আর. টমসন। কিন্তু ৮ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে সরকারের সচিবকে 'মেঘরায় মাঝি' সম্পর্কে জানালেন বীরভূমের দায়রা জজ তাকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। কারাদণ্ডের সময়সীমা সম্পর্কে ভ্রান্তি দেখা দেয়। তবে একই ব্যক্তি মনে হয়।

১৯.	রামমাঝি পিতা-অনন্ত	ঐ	৫ বছর সশ্রম দণ্ড ৯.১১.১৮৫৫	বয়স ৩৭। শ্যামবর্ণ, কান ফুটো। বাঁ-হাতে ৭টি টিকার চিহ্ন। ডান চোখের নিচে আলসার। উচ্চতা-৫´-৪″। সাঁওতাল। নিবাস-সুবুরপুর
২০.	বরসা মাঝি পিতা-বিশু	ঐ	ঐ	বয়স ৩৫। কৃষ্ণবর্ণ, কান ফুটো। বাঁ-হাতে ৬টি ও ডান হাতে ১টি টিকার চিহ্ন। উচ্চতা-৪´-১১″। সাঁওতাল। নিবাস ঐ

॥ গ ॥

দুটি তালিকা থেকে মোট ৪২ জন (২২+২০) বন্দীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গেল।[৫১ক] এতে লক্ষণীয় কয়েকটি দিক রয়েছে। যথা ;—

১. বিদ্রোহী, বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা যেসব অঞ্চলের বাসিন্দা, তাদের গ্রামনাম আসনা, সণ্ডা, ম্যাসাঞ্জোর, কাতনা, তেলাবনি, লেলিবনা, জেলাবাদ, সিউবনা, খেজুরি, বাগিংগা, কোটানোবেড়িয়া, সুবুরপুর ও গেরিয়াপানি প্রভৃতি। তবে দ্বিতীয় তালিকার ২০ জনের মধ্যে ১৭ জনই বীরভূম জেলার নলহাটি থানা অন্তর্গত গেরিয়াপানি গ্রামের অধিবাসী এবং ৩ জন ঐ থানারই সুবুরপুর গ্রামের বাসিন্দা।

২. প্রথম তালিকার ১৬ জনের দণ্ড হয়েছে কাতনা গ্রাম লুঠ ও ধ্বংসের জন্য। এরা সবাই আফজলপুর ও নলহাটি থানার লোক। এবং ৭নং দণ্ডিত সিংরায় মাঝি কাতনা গ্রামেরই বাসিন্দা।

৩. দুটি তালিকা মিলিয়ে ৪২–১টির বয়স উল্লেখ নেই, মোট ৪১ জনের নাম তালিকার মধ্যে গড় হিসাব নেওয়া যেতে পারে।

পর্যায়	বয়স-গড়	সংখ্যা
ক.	১৮ বছর বয়স পর্যন্ত	৬ জন
খ.	১৮-৩০ ” ” ”	৫ জন
গ.	৩০-৫০ ” ” ”	২৫ জন
ঘ.	৫০-৬০ ” ” ঊর্ধ্বে	৫ জন

এখানে লক্ষণীয়, সাঁওতাল যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিদু, কানু, চাঁদু ও ভৈরব। কানুর বয়স ৩৫, চাঁদের বয়স ৩০ এবং ভৈরবের বয়স ছিল ২০।

সরকারি নথিতে* সিদুর বয়স সম্পর্কে তথ্য না থাকলে-ও অনুমান করা যেতে পারে সিদুর বয়স কানু ও চাঁদের বয়সের ফারাকের মধ্যে-ই নিহিত। সেক্ষেত্রে, ৩২-৩৩ বছর হওয়াই সম্ভব। এখানে বলা যায় 'গ' পর্যায়ের অর্থাৎ মাঝ-বয়েসি মানুষজনই বেশি অংশগ্রহণ করেছিল। তবে ৫০ উর্ধ্ব মানুষজন-ও কম ছিল না।

৪. উল্লেখ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে, পিতা ও পুত্র একই সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

৫. অবশ্য লক্ষিতব্য। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাই সাঁওতাল নয়। কুমার, কামার ও পাহাড়িয়ামাল প্রভৃতির সম্প্রদায়েরও লোক ছিল।

॥ ৩ ॥

···সাঁওতাল যুদ্ধ : আক্রান্ত স্থান···

অম্বর
আজুরা
আফজলপুর
আমগাছিয়া
আমড়াপাড়া
ইঙ্গতপুর
উপরবন্ধ
কদমসাই
কলগাঁ
কাতনা
কুমারবাট
কেজুড়ি
কোটালপুকুর
খয়রাশোল
গাইবাথান
গুজোরি
গুণপুর
চন্দ্রদহ
চামুসাপাড়া
ছামোয়াপাড়া
জামতাড়া
তালডাঙ্গা
তালবনি
তাঁতিয়াপুর
তেলুবনি
দেউলি
দেওঘর
দেওচা
দিঘি
দুমকা
দুবরাজপুর
নাগর
নারায়ণপুর
নুনগোলা
পলসা
পাকুড়
পাঁচক্ষেতিয়া
পাহাড়িপুর
পিয়ালাপুর
পীরপাইঁতি
পুরিহারপুর
বড়বাতান
বাবুপুর
বারহেত
বাঁশকোলি
বিলকান্দু
বীরচন্দর
বৈদ্যনাথপুর
বৃন্দাবন
ভগনাডিহি
ভাগলপুর
মহম্মদবাজার
মহেশপুর
মিথিজানপুর
মৃত্যুঞ্জয়পুর
মুনকাতরো
মুনহান
রঙ্গালয়
রঘুনাথপুর
রক্ষাদঙ্গল
রাজাবাঁধ
রাজমহল
রাজোর
রাণীবিল
রামপুরহাট
লাওপি
লিটিপাড়া
লুরাজোড়
শানা
শ্রীকুণ্ডু
সংগ্রামপুর
সিউড়ি
সিদনালা
সুজারামপুর
সুরজোর
সুরুট
হলদিপাহাড়

* Judicial Proceedings No. 83, dated 20. 12. 1855

॥ ৪ ॥

...সাঁওতাল যুদ্ধের বিপক্ষে যাঁরা সৈনাপত্য করেছেন...

লেঃ গভর্নর স্যার এফ্‌ হ্যালিডে

প্রশাসনিক

ডব্লু, গ্রে, বঙ্গীয় সরকারের সচিব

আর, আই, রিচার্ডসন
বীরভূমের কালেক্টর

ডব্লু, এইচ্‌ এলিয়ট
বর্ধমানের কমিশনার

এ, সি, বিডওয়েল
অন স্পেশাল ডিউটি,
স্পেশাল কমিশনার

আই, আর, ওয়ার্ড
কমিশনার অন স্পেশাল ডিউটি

জে, আর, ওয়ার্ড
রাণীগঞ্জের কমিশনার

এ, ডব্লু, রাসেল
আণ্ডার সেক্রেটারি, বঙ্গীয় সরকার

জে, এম, এলিট
অফিসিয়েটিং কমাণ্ডার
রাজস্ব, ভ্রাম্যমাণ

জে, আর, ওয়েনস্‌
অন স্পেশাল ডিউটি

ডব্লু, ডব্লু স্কট
অফিসিয়েটিং কমিশনার

এ. আর টমসন
অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট

ফ্রান্সিস লাওথ
সেসান জজ

এ. ইডেন
এ্যাসিসট্যাণ্ট স্পেশাল কমিশনার

সৈনাপত্য

কর্ণেল বার্ড
কর্ণেল বার্ণি
ক্যাপটেন গট
ক্যাপটেন ফেগান
ক্যাপটেন ফোর্ড
ক্যাপটেন ফিলিপস
ক্যাপটেন ফুক
ক্যাপটেন বি, প্যারট
ক্যাপটেন বীচার
ক্যাপটেন ম্যাকফারসন,
ক্যাপটেন শেরউইল
ক্যাপটেন হ্যালিডে
ক্যাপটেন হিলিডে
চার্লস গৌড
লেফটেনাণ্ট অ্যালিভি
লেফটেনাণ্ট এইচ,ডব্লু,বি,গর্ডন
লেফটেনাণ্ট টৌলমিন
লেফটেনাণ্ট বারোজ
লেফটেনাণ্ট মুরাঙ্গ
মিঃ পৌলেট
মেজার মেমভার্ড
মেজর জেনারেল সি, বি, লয়েড
মেজর শাকবার্গ
মেজর ভিনসেণ্ট জ্যার্ভিস
সার্জেণ্ট গিলেন
সার্জেণ্ট কে. এম. স্কট
সার্জেণ্ট জ্যাকসন

মিঃ টুগুড
ম্যাজিস্ট্রেট, মুর্শিদাবাদ
মিঃ ব্রাউন, কমিশনার, ভাগলপুর
জে. পন্টেট, সুপারিনটেনডেন্ট দামিন-ই-কোহ

সরকারি নথিতে সামরিকপদ ও ব্যক্তির পদবী ব্যবহৃত হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই, পুরো নাম নয়। আবার, প্রশাসনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে সামরিক ও প্রশাসনিক স্তরে বীরভূম, ভাগলপুর বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যক্তিবর্গের নাম স্থান পেয়েছে।

॥ ৫ ॥

সাঁওতাল যুদ্ধের নায়কবৃন্দ

ঠাকুর মাঝি	আলহার মাঝি
(সিধুকানুর ভাগ্নে)	মুরারি মাঝি
মাটুর পারগাণা	রুমবদা মাঝি
শ্যাম পারগাণা	মেঘরায় মাঝি
মণি পারগাণা	হরিদাস মাঝি
রাম পারগাণা	বিনোদ মাঝি
বীরসিং মাঝি	চম্পাই মাঝি
সুন্দরা মাঝি	রামসা মাঝি
চাঁদরায় মাঝি	হারমা মাঝি
পুর্তো মাঝি	নিমাই মাঝি
নরসিং মাঝি	বুড়ো মাঝি
কার্তা মাঝি	মুন্তো মাঝি
সুন্নো মাঝি	পুথি মাঝি
কুদরু মাঝি	মোটা মাঝি
ভাদু মাঝি	বিজয় মাঝি
শিরু মাঝি	কর্তা মাঝি
ভৈরব সুবা	দুর্গা মাঝি
কানু সুবা	কামু মাঝি
সিদু সুবা	ধর্ত মাঝি
চাঁদ সুবা	গন্ডু মাঝি

রামা মাঝি
মহুয়া কোসেনজালা
গোচ্চ

ক. এছাড়া দণ্ডিত ব্যক্তি তালিকায় আরও কিছু সাঁওতাল বীর যোদ্ধার নাম দ্রষ্টব্য।

খ. সাঁওতাল গ্রামের সর্দারকেই সাধারণত মাঝি বলা হয়। কিন্তু আবার কারও কারও উপাধি মাঝি, তারা সর্দার নয়। উল্লেখ্য, বন্দীদের সাজা ও রেহাই প্রসঙ্গে 'মাঝি' শব্দের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। ২৫০৯ নং চিঠিতে বঙ্গীয় সরকারের সচিব ভাগলপুরের স্পেশাল কমিশনারকে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ তারিখে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি লেঃ গভর্নরের জ্ঞাতার্থে প্রাগুক্ত ব্যাখ্যা দিলেন কমিশনার সাহেব। চিঠি নং ৪৪ তারিখ, ২৬.৯.১৮৫৫।

'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ'

॥ পরিশেষ ॥

সিদ্ধির মৌহূর্তিকে, দু-একটি আশ্চর্য জিনিসের কথা বলতে চাই। সাঁওতাল গণযুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। তার প্রমাণ মেলে। 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখল, "যানারোহী এক সাওতাল সরদার ঐ দলের সঙ্গে ২ ছিল, গুলি দ্বারা তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইয়াছে তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ যে ঐ সরদার পুরুষ নহে, রমণী পুরুষ বেশে আসিয়াছিল।"[৫২] আমাদের উপস্থাপিত সাহিত্য পর্বেও এর দৃষ্টান্ত আছে। দ্বিতীয়ত, সাঁওতাল যোদ্ধারা দুর্গাপুজোরও আয়োজন করেছিল। সিদু ও কানুর নির্দেশে, নুনগোলা থানার একটি গ্রাম থেকে দুজন ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের উল্লেখিত 'বনবীর গাথা'-য় যেমন এর উল্লেখ রয়েছে, তেমনই সরকারি নথিতেও জানা যায়। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট তাঁর প্রতিবেদন (২৪. ৯. ১৮৫৫) এই প্রসঙ্গ জানিয়েছিলেন। শক্তি আরাধনার মধ্যে হিন্দু ধর্মমতের প্রতি সাঁওতালদের বিশ্বাসের ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার মতোই। তৃতীয়ত, সাঁওতালদের প্রাক্‌যুদ্ধ পর্বে কিছু কিছু গুজব এমন মাত্রা পেয়ে গেল যে, গোটা সাঁওতাল সমাজে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তার দুই-একটি :

ক. লাগলাগিন (নাগনাগিনী) সাপেরা ধেয়ে আসছে, লোক গিলে খাবে। অতএব বিহিত কর। পাঁচগ্রামের লোক একত্র হল, পরামর্শ করার জন্য। অর্থাৎ এর গুরুত্ব ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

খ. লায়েগড়ে (লোহাগড়) কুমারী মেয়ের গর্ভে সুবা জন্মেছে। অর্থাৎ ভগবান হাজির হয়েছেন পরিত্রাতারূপে।

গ. একটি মহিষ আসছে। যার আঙিনায় ঘাস খাবে সেখানেই থাকবে, সেই বংশের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্তই থাকবে। এই গুজবটির অর্থ হল, সকলেই গৃহ অংগন পরিষ্কার রাখবে ; যাতে বিদ্রোহীদের জমায়েত সভা-সমাবেশ, জল্পনা-কল্পনার স্থান পেতে অসুবিধা না হয়।[৫৩]

'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকোরেয়াক্ কাথা'-তে জুগিয়া হাড়াম এজাতীয় বেশ কিছু গুজবের কথা উল্লেখ করেছেন। সেসবের পরিচয় মনোগ্রাহী অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয়।[৫৪]

গুজবগুলি একসময় লোকবিশ্বাসের পর্যায়ে ওঠে। এবং সাঁওতাল জনজাগরণের পেছনে ব্যাপকভাবে কাজ করে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সুসংহত শক্তির কাছে আধুনিক মারণাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, রাজনৈতিক অসচেতন, অসংগঠিত, অসংহত শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে শক্তির লড়াইয়ে এতটা দ্রুত নিষ্পত্তি হতো না যদি সিদু কানুকে দেবত্ব মহিমায় আরোপিত করা না হতো। একটা কথা। জনশক্তির আধার এক বা দুই ব্যক্তি হতে পারে না। ধর্মের নামে যে সংগ্রাম শুরু হয় তার রূপ ও বিশেষত্ব সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না। ধর্মের জিগীর দিয়ে স্বাধীনরাজ্য গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্যে বারাসতে তিতুমীরের পতন, ফরিদপুরে দুদুমিঞার পতন লুকিয়েছিল। আবার সিদু কানুকে সাক্ষাৎ 'ঠাকুর' বানানোর মধ্যে কিংবা তিতুমীরকে 'পীর' দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার মধ্যে যে মহিমা আরোপ করা হয় তার অসাধারণত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং গণযুদ্ধ এক বা দুই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারে না। কতকগুলি প্রথাগত বিশ্বাস, লৌকিক সংস্কার, আবার অনুষ্ঠান বিদ্রোহের প্রেরণাদায়ক হলেও এসব অতিপ্রাচীন আদিম কৌশল প্রয়োগের মধ্যে দুর্বলতা লক্ষণীয়। সিদু-কানুর সুবা ঠাকুরত্বে অভিষেক, ডালপ্রেরণ—একটি বিশেষ সমাজে সাড়া পড়লেও সারাদেশে সার্বিক প্রেরণা বহন করতে পারেনি।[৫৫]

সাঁওতাল গণসংগ্রামে ব্যর্থতা থাকলেও মনে রাখতে হবে ; তাদের 'রাজনৈতিক জীবনদর্শন', 'রাজনৈতিক সংগঠন' ছিল না। অবশ্য সেই সময় তা সম্ভব ছিল না। আরণ্যক পরিবেশে, অশিক্ষা, নিস্তরঙ্গ জীবনচর্যার মধ্যে সেরূপ সাংগঠনিক প্রকৌশল গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি বটে। তা না থাক। তারা যে ঐক্য, বাক্যের সূত্রে মানুষকে গ্রথিত করতে পেরেছিল ; সেই প্রেক্ষাপট আজও প্রতীকমুখ্যতার দাবি রাখে। যাইহোক, তারা বুঝেছিল জমি, মাটি। যে 'কুমারী মাটিকে ফলবতী' করে তুলেছে, সেই জমি ও ফসলের মালিকানা তাদের। যে মেহনতে তারা তৈরি করেছে জনপদ তার মালিকও তারা। এসব ভোগের জন্যই তারা লড়াই করেছিল দিকু* জমিদার, মহাজন ও বিদেশী রাজের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে।[৫৬]

---

* সব শোষকই তাদের কাছে দিকু। দিকু দিক্ শব্দ থেকে উদ্ভূত। হিন্দিতে দিকু অর্থ প্রতারণা।

শ্রেণীগত ঐক্য বড় কথা। তার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না। গণআন্দোলনের ইতিহাসে দরিদ্র, নিপীড়িত, শ্রমার্ত মানুষের ঐক্য, সম্মিলন, গণপ্রতিরোধ অভিনব। আর, এই অভিনবত্বের কারণেই পরবর্তী কালের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে বলিষ্ঠ ঐক্য চেতনা যখনই অনুভূত হয়; তা সাঁওতাল গণজাগরণেরই বিম্বিত রূপ, প্রভাব চিহ্নিত বলে মনে হয়।

সিদু ও কানুর সংগ্রামী নেতৃত্ব সাঁওতাল জনসমাজ ও বাঙলার মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। 'সিদু-কানহু মেলা' তাঁদেরই স্মরণ মেলা। বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার কাশিয়া গ্রামে লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরেরদিন ও সাঁওতাল পরগণা জেলার বারহেত থানার ভগ্নাডিহিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই পবিত্র মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।[৫৭]

কলিকাতায় ৩০. ৬. ১৯৭৭ তারিখে শিক্ষিত আদিবাসী সমাজ 'সিদো কানহু দিবস' পালন করলেন।[৫৮] ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতাল বিদ্রোহের একশত পঁচিশ বছর পালন করলেন সাড়ম্বরে। প্রতি বছর ৩০শে জুন 'হুলদিবস' হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে পালিত হয়। কলিকাতায় আন্দোলনের কেন্দ্রভূমির নামায়ন হয়েছে 'সিদো কানহু ডহর'। আজ তা ব্যবহৃত হচ্ছে আন্দোলনের অন্তর্শক্তি প্রেরণার, প্লাটফর্ম হিসাবেই।*

আজও এই 'অরণ্যপ্রহরী'[৫৯]-দের নিয়ে অনন্য মূল্যায়ন হচ্ছে। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এঁরা মূর্ত হন। একটি উদাহরণ। পুরুলিয়ার স্বনামধন্য ছো-শিল্পী গম্ভীর সিংমুড়া এই যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে ছো-নাচ রচনা করেছেন। ইতিহাস জীবন্ত হয়। সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব রণাঙ্গনে হাজির হন। মুখোস পরা মাঝি মেয়ে নাচের ছন্দে ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করে। মেয়েদের বে-ইজ্জতির বদলায় কাঁড়-বাঁশ ধরে সাঁওতালের দল। রক্তঝরা দিনগুলি রোমাঞ্চ জাগায়, শিহরণ আনে।[৬০]

তাই শেষ কথায় বলি। বিদেশী রাজ না থাক, সমাজে যতদিন শোষণ-পেষণ, দলিতকরণ, অধিকার হরণ প্রভৃতি অকল্যাণ দিকগুলি সূচিত হবে; ততদিনই এই ঐতিহাসিক অনন্য পুরুষরা বন্দিত হবেন, নন্দিত হবেন, শ্রদ্ধিত হবেন গণযুদ্ধের ঠাট-ভাঙা অভিনবত্বে॥

---

* বীরভূমজেলার সিউড়িতে তৈরি হয়েছে 'সিধু-কানু উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র'। এবছর (১৯৯২) তারা 'হুলদিবসের' ত্রয়োদশ পূর্তি উৎসব পালন করলেন সাড়ম্বরে।

সাঁওতাল গণযুদ্ধ : উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি

১৮৩২-৩৩	দামিন-ই-কোহর সীমানা নির্ধারিত হয় সারভেয়ার ক্যাপটেন ট্যানারের নেতৃত্বে।
১৮৩৫	মিঃ জে. পনটেট দামিন-ই-কোহর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হন।
১৮৩৬	অন্তত ৪২৭টি সাঁওতাল গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৫১	১৫০০টি সাঁওতাল গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩ হাজার।
১৮৫১-৫৪	মিঃ পনটেট দামিন-ই-কোহর সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হন। ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ফৌজদারি দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৫৪	লক্ষ্মীপুর-সাসানের বীরসিং মাঝি বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের নিয়ে দল গঠন করেন।
১৫. ৫. ১৮৫৪	পনটেট সাহেবের রিপোর্টে মহাজন ও রেল কর্মচারিদের অত্যাচারের সত্যতা প্রকাশিত হয়।
২৪. ৬. ১৮৫৪	ভাগলপুরের সেসন জজ কমিশনারকে এক রিপোর্টে জানান সাঁওতাল বিদ্রোহীরা মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি করছে।
১৯. ৮. ১৮৫৪	নরসিং মাঝি ও কুদরু মাঝি কমিশনারের নিকট মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে নালিশী-পত্র লেখেন।
৩. ১১. ১৮৫৪	পনটেট মুনসেফের ক্ষমতা পেলেন।
৩০. ৬. ১৮৫৫	ভগনাডিহি গ্রামে সাঁওতাল গণসমাবেশ। দশহাজার সাঁওতাল গণসম্মিলনে অংশ নেয় শপথ গ্রহণ করে। কলিকাতা অভিমুখে গণপদযাত্রা শুরু হয়।
৭. ৭. ১৮৫৫	সিদুর হাতে দিঘিথানার দারোগা মহেশ দত্ত এবং কানুর হাতে দারোগার সঙ্গী মানিক মহাজন নিহত হয়। এই হত্যার মাধ্যমে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।
১১. ৭. ১৮৫৫	বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে মেজর বারোজ কলিগা আক্রমণ করেন।
১২. ৭. ১৮৫৫	সিদু-কানু চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে পাকুড় রাজবাড়ি লুণ্ঠন।
১৩. ৭. ১৮৫৫	সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী কদমসায়েরে হাজির হয়।
১৫. ৭. ১৮৫৫	ইংরেজ ও সাঁওতাল বাহিনীর যুদ্ধ হয় পাকুড়ের কাছে তরাই নদীতীরে। সাঁওতাল বাহিনীর পরাজয় ঘটে।
১৬. ৭. ১৮৫৫	পীরপাইঁতির যুদ্ধ। সাঁওতাল যোদ্ধাদের কাছে সেনাপতি বারোজের পরাজয়।

২০. ৭. ১৮৫৫	এই তারিখের মধ্যে সাঁওতাল সৈন্যদের অগ্রগমন, আধিপত্য বিস্তার। ইংরেজ সেনাবাহিনী পিছু হটে।
২১. ৭. ১৮৫৫	ইংরেজ বাহিনী কাতনা গ্রামে পরাজিত হয়।
২৩. ৭. ১৮৫৫	সাঁওতাল বাহিনী ব্যবসা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করতে থাকে। উল্লেখযোগ্য, গুণপুর বাজার ধ্বংস হয়।
২৪. ৭. ১৮৫৫	মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড সেনাবাহিনী নিয়ে রঘুনাথপুরে অতর্কিত আক্রমণ চালান তাতে কানু ও চাঁদের বাহিনী পরাজিত হয়।
২৭. ৭. ১৮৫৫	বৃন্দাবন ও বাঁশকোলির যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে। সেনাপতি টৌলমিন নিহত হন।
২৭. ৭. ১৮৫৫ থেকে ২. ৮. ১৮৫৫	ক্যাপটেন শেরউইল, ক্যাপটেন গর্ডন, ক্যাপটেন শাকবার্গের নেতৃত্বে সাঁওতাল পল্লী ধ্বংস হয়। শাকবার্গ একাই চল্লিশটি সাঁওতাল গ্রাম পুড়িয়ে দেন ও গবাদি পশু আটক করেন।
১৭. ৮. ১৮৫৫	সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করার জন্য সরকারি ঘোষণাপত্র জারী হয়।
১৯. ৮. ১৮৫৫	মহেশপুরের যুদ্ধে সিদু গুলিতে আহত হন। স্ব জাতীয় অথচ পুলিশের ইনফর্মার মুনিয়ামাঝির বিশ্বাসঘাতকতায় সিদু ধরা পড়েন।
২০. ৮. ১৮৫৫	দিনাপুরের সৈনাধ্যক্ষ ক্যাপটেন বীচারের কাছে সিদু ধরা পড়ার সংবাদ পেঁছোয়।
২৮. ৮. ১৮৫৫	সিদুকে ভাগলপুর জেলে পাঠানো হয়।
অক্টোবর, ১৮৫৫	সিদু ধরা পড়ার সংবাদে সাঁওতালরা বিভ্রান্ত হয়। এই সময় ব্যাপক অংশ সংগ্রামপুরে জড়ো হতে থাকে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালায়। কিন্তু সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজের অতর্কিত আক্রমণে সংগ্রামপুরের যুদ্ধে সাঁওতালরা ব্যর্থ হয় ও পিছু হটে।
১০. ১১. ১৮৫৫	সামরিক আইন জারী হয়।
১৭. ১১. ১৮৫৫	সিবিল সার্জেন এ. শেরিধান বীরভূম জেলে বন্দীদের করুণ দশা সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান।
২২. ১১. ১৮৫৫	শেরিধানের রিপোর্ট পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এ. আর. টমসন সরকারকে জেলের বন্দীদের দুর্ভোগের কথা অবহিত করেন।
নভেম্বর, তৃতীয় সপ্তাহ ১৮৫৫	কানু ও তাঁর অপর দুইভাই—চাঁদ ও ভৈরব হাজারিবাগ পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েন। পুলিশের ইনফর্মার জারোয়ার সিং তাঁদের ধরিয়ে দেন।

১. ১২. ১৮৫৫	কানু ও তাঁর ভাইদের ধরা পড়ার সংবাদ টেলিগ্রাফের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
৪. ১২. ১৮৫৫	ক্যাপটেন ফিলিপস কাজুরিয়ার ১৫ মাইল দূরবর্তী জঙ্গল থেকে ২৫০ জন নিরস্ত্র সাঁওতালকে বন্দী করেন। ৪০০০ গবাদিপশু আটক করেন।
৫. ১২. ১৮৫৫	বঙ্গীয় সরকারের সচিব ভাগলপুরের অস্থায়ী কমিশনার বিড়ওয়েল সাহেব সিদুর মৃত্যু দণ্ডের কথা জানান।
৩. ১. ১৮৫৬	সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২৩. ১. ১৮৫৬	কীর্তা মাঝির নেতৃত্বে সুজাপুরের গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠি লুঠ হয়।
২৭. ১. ১৮৫৬	লেফটেনাণ্ট ফেগান ভাগলপুরের হিল রেঞ্জার্স বাহিনী নিয়ে সাঁওতালদের ওপর আক্রমণ চালান। সরাসরি যুদ্ধে সাঁওতালদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।
২৩. ২. ১৮৫৬ বেলা ২টায়	ভগনাডিহির ঠাকুর বাড়ি অঙ্গনে কানুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই একরকম গণযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।